KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ২৪ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title : সমকালীন (SAMAKALIN)	Size : 7"x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : ৮/- ৮/- ৮/- ৮/- ৮/-	Year of Publication : বৈশাখ, ১৩৬৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭ আষাঢ়, ১৩৬৭ শ্রাবণ, ১৩৬৭ ভাদ্র, ১৩৬৭
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

★ ARUNA ★

more DURABLE
more STYLISH

SPECIALITIES

Sanforized :
Poplins
Shirtings
Check Shirtings
SAREES
DHOTIES
LONG CLOTH
Printed :
Voils
Lawns Etc.

in Exquisite Patterns

ARUNA MILLS LTD.
AHMEDABAD

★ ARUNA ★

সম্পাদক। আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

অষ্টম বর্ষ ॥ আষাঢ় ১৩৬৭

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
৮৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা ৭০০০০৯

তারপর একদিন ...

বাবার হাতের গাঁইতি খানাও ওর কাছে খেলনা। ইস্পাতের ঐ গাঁইতি খানার সাথে বাবার শক্ত হাত দুটোর সম্পর্কের কথা ওর জানা নেই। বাবার মতো বাবা সেজে ও খেলা করে। টেলিগ্রাফের ঐ টানা টানা তারগুলো ওর কাছে এক বিস্ময়, আরও বিস্ময় তারের ঐ গুণগুণানি। কিন্তু আজ ও যে শিশু···
তারপর একদিন ঐ শিশুই হয়ে উঠবে দেশের এক দায়িত্বপূর্ণ নাগরিক। কর্ত্তব্য আর কর্ম্ম হবে ওর জীবনের অঙ্গ; ছেলেবেলার সব খেলাই সেদিন কর্ম্মে রূপান্তরিত হবে। জীবনে আসবে ওর বোধন আর চেষ্টা। মহৎ কাজের প্রচেষ্টা থেকেই একদিন শ্রান্তিময়, ক্লান্তিময় পৃথিবীতে আনন্দ আর সুখ উৎসারিত হবে। বৈচিত্র আর অভিনবত্ব জীবনকে করে তুলবে সুন্দরতর।

আজ সমৃদ্ধির গৌরবে আমাদের পণ্যদ্রব্য এ দেশের সমগ্র পারিবারিক পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন, সুস্থ ও সুখী করে রেখেছে। তবুও আমাদের প্রচেষ্টাএগিয়ে চলেছে আগামীর পথে—সুন্দরতর জীবন যানের প্রয়োজনে মানুষের চেষ্টার সাথে সাথে চাহিদাও বেড়ে যাবে। সে দিনের সে বিরাট চাহিদা মেটাতে আমরাও সদাই প্রস্তুত রয়েছি আমাদের নতুন মত, নতুন পথ আর নতুন পণ্য নিয়ে।

আজও আগামীতেও দেশের সেবায় হিন্দুস্থান লিভার

PR.3-X52 BG

অষ্টম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা **সমকালীন** আষাঢ় ১৩৬৭

॥ সূচীপত্র ॥

নাট্যশাস্ত্রের রচনা। অমিয়নাথ সান্ন্যাল ১৪৭

দেকামেরণের বোক্কাচ্চিয়ো। ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য ১৬০

কবিতার ওজন ও কৌতুকরস। অজিতকৃষ্ণ বসু ১৬৬

ইউজেন বিউরণফ্। গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত ১৭৩

মার্ডিগ্লিয়ানি। মীরা দত্ত ১৭৭

রবীন্দ্ররচনা সূচী। পুলিনবিহারী সেন ১৭৯
পার্থ বসু

সমালোচনা—সোমেন বসু, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়
নমিতা চক্রবর্তী ১৮৩

॥ সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ॥

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড্ কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

উত্তর প্রদেশের সংস্কৃতির চার হাজার বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায় ভারতীয় আর্যসভ্যতার যুগে। পরাক্রান্ত মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে শিল্প ও সংস্কৃতিতে এক নতুন ধারার সুরু হ'ল। বাদশাহী আমলের জাঁকজমক ও শিল্পবোধ অমর হ'য়ে রইল মোগল স্থাপত্য, চিত্রকলা ও সঙ্গীতের মধ্যে। বিরাট কল্পনা ও সূক্ষ্মতম কারিগরীর অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে মোগল স্থাপত্যে—কালজয়ী এই সব সৃষ্টি আজও সারা পৃথিবীর বিস্ময় জাগায়।

ভারতবর্ষের যেখানেই যান, লাল পাথরে গড়া ফতেপুর সিক্রীর নিস্তব্ধতা থেকে তাজমহলের অকলঙ্ক শুভ্রতা পর্যন্ত সর্বত্রই আপনার স্মরণীয় মুহূর্তগুলোকে আরও উপভোগ্য ক'রে তুলবে উইল্‌স-এর গোল্ড ফ্লেক সিগারেটের অতুলনীয় স্বাদগন্ধ।

গোল্ড ফ্লেকের চেয়ে

ভালো সিগারেট কোথায় পাবেন

৫০ টার দাম ৪ টাকা · ২০ টার দাম ১ টাঃ ৬০ নঃ পঃ · ১০ টার দাম ৮০ নঃ প

দি ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো কোম্পানী অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড কর্তৃক প্রচারিত

অষ্টম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা সমকালীন আষাঢ় তেরশ' সাতষট্টি

নাট্যশাস্ত্রের রচনা

অমিয়নাথ সান্যাল

নাট্যশাস্ত্রের কান্ড-পল্লব অংশই প্রধান। ছায়া-ভূমিক অংশ প্রধান অংশের অধীন, অথচ উৎক্ষিপ্ত অংশ। দেখা যায় এই দুই অংশের রচনা-পদ্ধতিও ভিন্ন রকমের। এই ভিন্নত্ব আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত দু'টি সংস্করণের ভাসা-ভাসা সমালোচনা করে একটিকে "লং রিসেন্‌শন্‌" আর অন্যটিকে 'শর্টরিসেন্‌শন্‌' বলে লাভ নেই; অথবা, দুটি সংস্করণের মধ্যে "রি-হ্যান্ডা্‌লিং" এর লক্ষণ আছে বললে কিছু নূতন কথা বা পরিচয় প্রকাশিত হয় না। যথার্থত, কোথায় নির্দোষ প্রক্ষেপ কোথায় সদোষ প্রক্ষেপ ঘটেছে, কোথায় কোন্‌ প্রত্যাশিত অংশের অবলোপ ঘটে, কোথায় বা উৎক্ষেপ ঘটেছে, ইত্যাদি রকমের অনুশীলনই কাম্য। সংগ্রহ-শাস্ত্রের রচনাপদ্ধতি বা 'মেথডলজি অব্‌ ট্রিটমেন্ট' না জানলে উক্ত রকমের ন্যায্য তর্ক-সংশয় নিরস্ত হতে পারে না।

রচনা-পদ্ধতি অনুশীলন পক্ষে **সব চেয়ে প্রধান** কথা হ'ল অভিপ্রেত অর্থ উদ্ধার করা। এবং **সর্বপ্রথম বিড়ম্বনা** হ'ল এই যে **কোনও সংস্করণেই আদ্যোপান্ত সমস্ত শ্লোকের যথাযোগ্য সংখ্যা-চিহ্ন লিপিবদ্ধ নয়।** সাধারণত চার চরণে শ্লোকের নিবৃত্তি। কিন্তু, অর্থ-সমাপ্তির উদ্দেশ্যে কখনও দুই চরণ, কখনও বা ছয় চরণেও শ্লোক-নিবৃত্তি ঘটে ও ঘটেছে। এই ব্যতিক্রম অবহেলা করে শ্লোক-সংখ্যা চিহ্নিত করা হয়েছে। দুঃখের কথা, ঐ পূর্বতন সম্পাদন-ত্রুটি আজ পর্যন্ত অশোধিত থেকে গিয়েছে। **ফলে প্রতি শ্লোকের চার-চরণ ধরে অর্থ-উদ্ধার ও অনুবাদ-চেষ্টা বিড়ম্বিত হ'তে বাধ্য।** একটি দৃষ্টান্তে পরীক্ষা করা যেতে পারে।

৬ অধ্যায়ে ১০ম শ্লোকে নাট্যসংগ্রহের বিষয়-নাম পঠিত হয়েছে। পরেই ১১ শ্লোকে **কারিকা-লক্ষণ** বর্ণিত হয়েছে। এর পরেই ১২ ও ১৩ শ্লোক পঠিত যথা—

নানানামাশ্রয়োৎপন্নং **নিঘন্টুং** নিগমান্বিতম্‌।
ধাত্বর্থ হেতু সংযুক্তং নানাসিদ্ধান্তসাধিতম ॥ ১২ ॥ ৬ অঃ।
স্থাপিতোঽর্থো ভবেদ্‌ যত্র সমাসেনার্থসূচকম্‌।
ধাত্বর্থবচনেনেহ **নিরুক্তং** তং বিদুর্বুধাঃ ॥ ১৩ ॥ ঐ।

পড়লেই মনে হয়, এই দু'টি শ্লোকে একত্রে 'নিরুক্ত' শব্দের লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তা নয়। এস্থলে নানানামাশ্রয়োপেতং নিঘন্টুং নিগমান্বিতম্‌।

ইতি দু'ই-চরণ বাক্য স্বতন্ত্র ভাবে **"নিঘণ্টু" জাতীয় শব্দের লক্ষণ বর্ণনা করে।** এবং "যাস্কার্থহেতুসংযুক্তম্" ইত্যাদি ও "নিরুক্তং তং বিদুর্ঋষাঃ" **ইত্যন্ত ছয় চরণ নিরুক্ত-লক্ষণ বর্ণিত করে।** এরকম সিদ্ধান্তের হেতু আছে।

১১ শ্লোকে কারিকা-লক্ষণ বর্ণিত। **কারিকার বিশিষ্ট উপাদান হ'ল নিঘণ্টু ও নিরুক্ত ইতি দু'ই শ্রেণীর শব্দ।** যে শব্দ পূর্বসিদ্ধ অথচ অব্যুৎপন্ন রূপে সাম্প্রদায়িক শ্রুতিগত, এবং **নিগমান্বিত** (নিশ্চিত রূপে গম অর্থাৎ সিদ্ধ ও প্রচলিত ইতি নিগম, সেই নিগম-লক্ষণ দ্বারা অন্বিত), **সেই শব্দই "নিঘণ্টু" শ্রেণীতে গণ্য। এগুলি স্বরূপে নাম-শব্দ।** যথা ডিম, নংকুট, যবনিকা, স্বর, গান্ধার প্রভৃতি বহু নাট্যশাস্ত্রোল্লিখিত শব্দ। অর্থবশে বা প্রয়োজন বশে এ রকম শব্দ উপদেশবাক্যের বা প্রসঙ্গের **নানা আশ্রয়ে** অভ্যুপগত হয়েছে। এই শব্দগুলি ধাতু-অর্থ-হেতু দ্বারা সিদ্ধ নয়, সাধ্যও নয়। **'নিঘণ্টু' শব্দটি স্বয়ং নিঘণ্টু!**

অন্য নিরুক্ত (নিঃ নিঃশেষে + উক্ত, সিদ্ধ) শব্দ ধাতু অর্থ-হেতু সংযুক্ত, নানা সিদ্ধান্ত দ্বারা সাধিত। এর অর্থ স্থাপিত বা আরোপিত ও হ'তে পারে। কখন কখন সমাসবদ্ধ হয়ে নিরুক্ত শব্দ অভিপ্রেত অর্থের নিষ্পাদক হয়। **যে রকমেই অর্থ-সাধক হ'ক, সম্প্রতি বক্ষ্যমান এই "নিরুক্ত" ধাতু-অর্থঘটিতবচন দ্বারা উপলভ্য,** যথা নিঃ+উক্ত ইতি নিরুক্ত।

নিরুক্ত পক্ষে উৎকৃষ্ট একটি দৃষ্টান্ত যথা "শৃঙ্গার" শব্দ। এস্থলে শৃঙ্গ অর্থে বিশেষ করে কৈলাস বা হিমবান শৃঙ্গ। "শৃ" ধাতুর (গমনার্থে বা অধিগতার্থে) উত্তর অরু = অধিগত, অধিকৃত। কৈলাস শিখরে হর-পার্বতী-পরিকরাদির লীলা-সিদ্ধি পুরাণ প্রসিদ্ধ। সেই লীলা আবেশ দিব্য-বেশালঙ্কার ভূষিত্ব এবং গান্ধর্ব অর্থাৎ দিব্য গীতবাদ্য নৃত্ত লক্ষণান্বিত। পূর্ব-প্রসিদ্ধ তথা গুর্বাচার-সিদ্ধির অনুগত রূপে 'শৃঙ্গার' উজ্জ্বল বেশাত্মক, শুচি, মেধ্য ও দর্শনীয় বলা হয়েছে।

অতঃপর, **ধর্ম-শৃঙ্গার অর্থ ধর্মানুষ্ঠান কল্পে তদুপযোগী দেশমাল্যাভরণাদির উপচার; অর্থ-শৃঙ্গার** অর্থে অর্থী-অর্থোপজীবিকা সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান কল্পে তৎকর্মানুযায়ী উত্তম বেশাদির সজ্জা; **কাম শৃঙ্গার** অর্থে কামী-কামোপজীবিকা সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান কল্পে তদনুযায়ী উত্তম বেশাদির সজ্জা; ইতি আরোপিত অর্থ (২০ অঃ, ৭৬ শ্লোক থেকে ৭৯ শ্লোক, "ত্রি-শৃঙ্গার" দ্রষ্টব্য)।

নাট্যশাস্ত্রীয় পরিভাষাগত নিঘণ্টু ও নিরুক্ত সম্বন্ধে বলা যায় যে, ভরত মুনির কালে 'অভিধান' নামে কোষ-জাতীয় গ্রন্থ ছিল না। কিন্তু, **নিঘণ্টু ও নিরুক্ত নামে ততৎ শ্রেণীর শব্দার্থ-সংগ্রহ ছিল।** নচেৎ, শিল্প-বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও অভ্যুদয় সম্ভব হ'ত না। সেই নিঘণ্টু ও নিরুক্ত লুপ্ত। ফলে, পরবর্তীকালের অভিধানে **'শৃঙ্গারযোনী' অর্থে কন্দর্প বা কামদেব** ইতি ধারণান্তরবিশেষ দ্বারা কাব্য-সাহিত্য সেবা আপ্যায়িত হয়েছে। **শৃঙ্গার-যোনি অর্থ দিব্যশৃঙ্গার পটভূমিকার আকর বা উৎপত্তিস্থান অর্থাৎ কৈলাস-শৃঙ্গস্থ হেমকূট।* লক্ষণিক অর্থে মহাদেবই শৃঙ্গার যোনী। কন্দর্প নয়। কবি কালিদাস একটি শৃঙ্গারযোনী দ্বারা অপর একটি শৃঙ্গার-যোনীকে ভস্মীভূত করিয়েছেন বটে, কিন্তু সেই ভস্মই শব্দকোষ ও কাব্য-সাহিত্যে ছড়িয়ে পড়েছে।** অনুবাদ-সাহিত্যের মধ্যে সেই ভস্ম দেখা দেয় আধুনিক বিভূতির রূপে! অর্বাচীন কাব্য-সাহিত্যিকেরা অবশ্যই বলতে পারেন "যসোলাভার্থে কিং কিং নক্রিয়তে ময়া!" এবং আধুনিক কোন কোনও নাট্যকারেরা ত' বলবেনই "আমাদের কারবারই হ'ল কন্দর্প-বিভূতি নিয়ে।

* ১৪ অধ্যায়ে ২৭ শ্লোক থেকে ৩১ শ্লোক পর্যন্ত স্তর দ্রষ্টব্য।

শিব-ভস্ম নিয়ে নয়! "

ফল কথা, নাট্যশাস্ত্রীয় উপদেশের মধ্যে নিঘণ্টু ও নিরুক্ত শ্রেণীর শব্দগুলি প্রকীর্ণ রয়েছে। অনুশীলন দ্বারা বুঝায়ায় নাট্যসংগ্রহ সংশ্লিষ্ট উপদেশের মধ্যে নিরুক্ত শব্দেরই প্রাধান্য, নিঘণ্টু শব্দ সংখ্যায় অল্পতর। গান্ধর্বসংগ্রহের মধ্যে নিঘণ্টু শব্দ সংখ্যায় অধিকতর।

যাই হ'ক, ১২ শ্লোকের পূর্বার্দ্ধে বাক্যটি নিঘণ্টুর লক্ষণ বর্ণিত ক'রে। সুতরাং শ্লোক চিহ্ন পক্ষে

নানানামাশ্রয়োপেতং নিঘণ্টুং নিগমান্বিতম্ ॥ ১২ ॥ ইতি পাঠ হওয়া উচিত।

একটি সংশয়

১৪ শ্লোক যথা —

সংগ্রহো যো ময়া প্রোক্তঃ সমাসেন দ্বিজোত্তমাঃ।
বিস্তরং তস্য বক্ষ্যামি **সনিরুক্তং সকারিকম্** ॥

এই বাক্যের মধ্যে নিরুক্ত ও কারিকার উল্লেখ আছে, কিন্তু—নিঘণ্টু উল্লিখিত হয়নি। সুতরাং সংশয় এই যে নিঘণ্টু-লক্ষণ বর্ণনা ভরত মুনির অভিপ্রেত নয়।

সংশয় নিরসন কল্পে বলা যায়, যে এই শ্লোকের 'যঃ সংগ্রহঃ ময়া প্রোক্তঃ" বাক্যের অর্থ হ'ল—**পূর্বে ১০ম শ্লোকে "যে নাট্য সংগ্রহ আমি উপদেশ করেছি"।** তাৎপর্য এই যে উক্ত নাট্য সংগ্রহের বিষয়গুলির বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিমিত্ত নিরুক্ত ও কারিকার সাহায্য গ্রহণ করব, মুখ্যত। কারণ—নাট্যোপদেশের মধ্যে নিরুক্তেরই প্রাধান্য, নিঘণ্টু প্রধান ত' নয়ই, এমন কি বিরল। এস্থলে **গান্ধর্ব-সংগ্রহ প্রশ্নকারী মুনিগণের (৬ অঃ ১, ২, ৩ শ্লোক) দৃষ্টীভূত নয়, ভরত মুনির উত্তর বচনেরও অধিকৃত নয় (৬ অঃ ৪, ৫ শ্লোক)। কিন্তু, উভয় সংগ্রহের পক্ষে সাধারণভাবে কিছু কিছু নিঘণ্টু শ্রেণীর শব্দ ভরত মুনি ব্যবহার করবেন, এই সংকল্পের বশেই ১২ শ্লোকে নিঘণ্টুর লক্ষণ বর্ণনা করেছেন।** বিশেষ উদ্দেশ্য এই ছিল যে—'নিরুক্ত' শব্দগুলি আরোপিত অর্থে ও ব্যবহার করা যায়, এদের রূপও ঈষৎ পরিবর্তিত হ'তে পারে। **কিন্তু নিঘণ্টু শব্দগুলি তদ্রূপেই ব্যবহার করা উচিত।** ভবিষ্যৎ কালে 'ডিম' শব্দটিকে 'অন্ত' শব্দে রূপান্তরিত বা অর্থান্তরিত করা একেবারেই নিষিদ্ধ! 'যবনিকা' শব্দটি 'যবন'-শব্দ-জাত ক'রে পরে তাথেকে "যবনী" (যবনী স্ত্রীলোক) শব্দ কল্পনা করে, পরে যথেচ্ছাক্রমে 'যবনিক' 'যবনীক' 'যবনিকা' বা 'যবনীকা' শব্দ কল্পনা করে অর্থাপত্তি দ্বারা—রঙ্গ পীঠকে স্ত্রীলোক কল্পনা ক'রে, 'যবনিকা' অবগুণ্ঠন স্বরূপ মনে করে, নাট্যশাস্ত্রীয় 'যবনিকা' শব্দের ব্যাখ্যা করণ নিষিদ্ধ। নিঘণ্টু শব্দকে তদ্রূপে জানলে ঐ রকম "পাক দিয়ে সূত্য লম্বা করো" গবেষণা নিরুদ্ধ হয়। না জানলে কিন্তু চেষ্টা হ'তে পারে। অতএব—একাধিক হেতুতে নিঘণ্টু শব্দের লক্ষণ বর্ণনার প্রয়োজন ছিল।

প্রসঙ্গত, সূত্র ও ভাষা শব্দ দু'টি উল্লিখিত হ'লেও, এই দু'ই বস্তুর সংজ্ঞা লক্ষণ বর্ণিত হয়নি। এক মাত্র হেতু এই যে ভরতের কালে নাট্যসংসদের জ্ঞানী ব্যক্তিরা তথা সাধারণ বিশ্বজনেরা সূত্র ও ভাষা বিষয়ে সর্বতন্ত্রসম্মত সংজ্ঞা-লক্ষণ স্বীকার করে নিয়েছিলেন, সুতরাং ভরত মুনি নূতন করে ঐ বস্তু দু'টির সংজ্ঞা-লক্ষণ বর্ণনা করেননি। অন্যপক্ষে 'সংগ্রহ' 'কারিকা' "নিঘণ্টু" ও 'নিরুক্ত' পক্ষে মতভেদ ছিল বলেই নাট্যোপদেশের উপযোগী মত গ্রহণ করে সংগ্রহাদির লক্ষণ উপদেশ করেছেন।

শ্লোকের যথাযোগ্য নিবৃত্তি ও সংখ্যা-চিহ্নকরণ বিষয়ে প্রচুর ব্যতিক্রম দেখা যায়। ব্যতিক্রম সন্দেহ করে অর্থনির্ণয় করা ব্যতীত উপায় নেই।

শ্লোকের অর্থোদ্ধার পক্ষে অন্য বাধাও আছে। কোনও একটি নিরুক্ত শব্দ ভরত মুনির কালে যে বিশিষ্ট ও নিশ্চিত অর্থে ব্যবহৃত হ'ত, পরবর্তী মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের কাব্য-সাহিত্য-কোষকার ব্যক্তিগণ সেই মৌলিক বা মুখ্যার্থ ত্যাগ করে অন্যরূপ অর্থে গ্রহণ করেছেন। **অর্থাৎ শব্দটি অবিকৃত, অথচ মানসিক বা মনন ঘটিত সংস্কার বিকৃত।** শব্দ প্রাণহীন বস্তু; অর্থারোপকারী মনুষ্যই সচেতন। সুতরাং অর্থবিকৃতি হ'ল চেতনারই বিকার! আধুনিক বিজ্ঞতাভিমানী কোনও ব্যক্তি হয়ত বললেন "সংস্কৃত হ'ল মৃত ভাষা।" কথাটি অবশ্য "কোটেশন্ মার্কা" জ্ঞানেরই পরিচয় দেয়! সংস্কৃত-ভাষা বেচারা প্রাণহীন পদার্থ। কিন্তু, বক্তাই স্বয়ং প্রাণবান হয়েও মুমূর্ষু, এই কথাটিই জানিয়ে দিলেন! যাই হ'ক, এরকম ব্যাপার অনিবার্য। **প্রাচীন শাস্ত্রের বিশেষ করে নাট্যশাস্ত্রের শব্দার্থ উদ্ধার কালে উক্ত মানস-পরিণামী সংস্কার ত্যাগ না করলে যোগ্য অর্থ উদ্ধারের আশা নেই। যথা, 'গণিকা' ও 'বেশ্যা' শব্দ।** এ দু'টি একার্থ-বাচক শব্দ নয়। বেশ্যার সাধারণ্যই হ'ল লক্ষণ। বেশ্যা কখনও গণ্যা হয় না। কিন্তু গণিকার অসাধারণ-গণ্যত্ব ছিল, এখনও আছে। গণিকা বলতে যথার্থত কি বুঝায়, নাট্যশাস্ত্রের ৩৫ অধ্যায়ে ৬০, ৬১, ৬২ শ্লোকের মধ্যে তার অসাধারণ পরিচয় আছে। সেই পরিচয়ের নির্গলিত সার যথা—যিনি নাট্যশিল্প-জগতে উত্তম নায়িকার ভূমিকাভিনয়ে উত্তম পাত্রী রূপে গণ্যা, তথা তদ্রূপে সর্বলোক মান্যা, তিনিই গণিকা নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্যা। বলাই বাহুল্য, 'বেশ্যা' ও 'গণিকা' উভয়ই নিরুক্ত শ্রেণীর শব্দ।

অন্য দৃষ্টান্ত, যথা, ২০ অধ্যায়ে উপদিষ্ট **'দশ রূপ'**। এস্থলে **'রূপ'** অর্থে নাটক, প্রকরণ, সমবকার প্রভৃতি **লেখ্য-রচনার গঠন-বৈশিষ্ট্য নিবন্ধন স্বরূপ বা স্বভাব।** ইংরাজিতে অনুবাদ করতে হ'লে দশ রূপকে 'টেন্ ফরম্‌স্' বলাই সঙ্গত, 'টেন্ ডিভিজনস' নয়।

প্রসঙ্গত, ২০ অধ্যায়ে ৫ম শ্লোকে **'বৃত্তি'** উল্লিখিত হয়েছে। **এই বৃত্তি** হ'ল কৈশিকী, সাত্ত্বতী, ভারতী, আরভটী ভেদে চার রকম (২২ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোক-স্বভাবের বিশিষ্ট প্যাটার্ণ ছিল; এখনও আছে। এই প্যাটার্ণকে নাট্যোপযোগী করে নাট্যে প্রতিফলিত করলে নাট্যশাস্ত্রীয় 'বৃত্তি' সিদ্ধ হয়। সুতরাং **বৃত্তিকে "ড্রামাটাইজ্‌ড্ প্যাটার্ণ"** বলা উচিত। একে 'স্টাইল্' বলা যায় না। যে অনুবাদক মহাশয়বৃন্দ 'শৃঙ্গার-রস' অর্থে 'এরোটিক্ সেন্টিমেন্ট' শব্দ দিয়ে ভাষান্তরিত করেছেন, তাঁরাই ধর্মার্থকাম-ইতি 'ত্রিশৃঙ্গার'কে "থ্রী কাইন্ড্‌স্ অব্ লভ্" শব্দ দিয়ে ভাষান্তরিত করেছেন, এবং তাঁরাই বৃত্তিকে 'স্টাইল্' শব্দ দ্বারা ভাষান্তরিত করেছেন! এই অনুবাদক মহোদয়বৃন্দ যখন গান্ধর্ব-সংগ্রহের "মাগধী" "অর্ধমাগধী" **"সম্ভাবিতা"** ও **"পৃথুলা" নামে "রীতি"** অনুবাদ করবেন, তখন আর "স্টাইল" বলা চলবে না। কিন্তু—ঐ চারটি **"রীতি" হ'ল যথার্থত "স্টাইল্" ছাড়া আর কিছু নয়।**

মানস-সংস্কার নিবন্ধন শব্দার্থের বিভ্রান্তি সম্ভাবনার দিঙ্ নির্ণয় করে ক্ষান্ত হ'ই। নাট্য শাস্ত্রীয় পরিভাষার অভিপ্রেত অর্থ উদ্ধার করতে হ'লে নাট্যশাস্ত্রের চশমা পরে সম্পূর্ণ বাক্যের ভাবার্থ গ্রহণে তৎপর হওয়া উচিত। অতঃপর পারিভাষিক শব্দের অর্থ ব্যাখ্যাদি কল্পে পরতন্ত্র-সিদ্ধান্তের চশমা পরলে যা ফল হবে, তা ত' বুঝাই গেল।

সম্প্রতি, রচনা-পদ্ধতি আলোচ্য।

ভরত মুনি * কার্যত যে ভাষায় মৌখিক উপদেশ করেছিলেন, সংগ্রহ শাস্ত্রের রচনা অবিকল

---

* [ইংরাজী ভাষায় অনুবাদক পক্ষদের মত এই যে—ভরত বলতে কেউ ছিলেন না। কতিপয় নাট্য বিচক্ষণ ব্যক্তিরা মিলে মিশে নাট্যশাস্ত্র রচনা করেছিলেন। এবং ভরত নামে কল্পিত ব্যক্তিকে

সেই ভাষণের আনুপূর্বিক প্রতিচিত্র, **এমন মনে করার হেতু নেই।** বরং মনে করা যায়, ভরত মুনি তখনকার প্রচলিত কোনও কথ্য-ভাষা অবলম্বন করে মুখ্য উপদেশ করেছিলেন, এবং এর মধ্যে বহু পূর্বসিদ্ধ সংস্কৃত শ্লোক উদাহরণপূর্বক ব্যাখ্যাও করেছিলেন।

কিন্তু—মুনির সমগ্র উপদেশাবলী সেই কালেই সংস্কৃত ভাষায় আদ্যোপান্ত বিরচিত হয়েছিল। ভরত মুনির সাক্ষাৎ শিষ্যবর্গই এই বিরচিত সংগ্রহ-শাস্ত্রের আদিতম লেখক বা সম্পাদক। বিরচিত অর্থাৎ বিশিষ্ট উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট রূপে রচিত বা গ্রথিত, বা সংকলিত বা সম্পাদিত।

নাট্য সংগ্রহ ও গান্ধর্ব-সংগ্রহকে মূল ও প্রতিষ্ঠিত আধার-শাস্ত্র মনে করলে, এক মাত্র ভরত মুনিকেই **মূল উপদেষ্টা** স্বীকার করতে হয়। উপদেষ্টার উপদেষ্টা, তারও উপদেষ্টা, ইত্যাদি ক্রমে সংখ্যা-গৌরবের ত' কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই! অতঃপর—সংগ্রহ-শাস্ত্রের বিরচন পক্ষে এক বা একাধিক পুরুষের কৃতিত্ব স্বীকারে বা অস্বীকারে ক্ষতি বৃদ্ধি নেই।

রচনা আপাত দৃষ্টিতে সরল, সজ্জিত ও সুসংস্কৃত। কিন্তু মতি-গতিতে কিছু কূট বা বক্রভাব লক্ষ্য হয়। রচনা বা বাকগ্রথনের উদ্দেশ্য বুঝে রচনার রীতি ও পদ্ধতি বিচার্য। নাট্য-গান্ধর্ব সম্প্রদায়ের বিশেষ গরিষ্ঠ জ্ঞানাবলীকে যুগের পর যুগ ধরে সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যেই

শাস্ত্রোপদেষ্টা রূপে প্রচার করেছিলেন।. এক কথায় নাট্যশাস্ত্র হ'ল বারো-ইয়ারি রচনা! ভরত মুনির নামটি নিছক মিথ্যাপ্রচার! ভারত ইতি নাম রামায়ণে ও মহাভারতে আছে। কিন্তু "নাট্যশাস্ত্র" রচয়িতা ভরত বলতে প্রামাণিক অস্তিত্ব নেই।

এই মতটি অবহেলার যোগ্য নয়, কারণ, **অনুল্লেখই এ'দের প্রামাণ্যও হেতু।** অনুল্লেখ যথা রামায়ণ-মহাভারতে, উপনিষদে বেদে, ও পুরাণে কৃষ্ণ-জীরার উল্লেখ নেই, কৃষ্ণজীরা-সংগ্রাহক বণিক পুরুষ বিশেষের নাম নেই, সুতরাং—ঐ প্রাচীন কালে উক্ত সমাজের পাচকেরা কৃষ্ণ-জীরা নামে বস্তুটি ব্যবহার করত না।

আমার কথা এই যে—**ভরত মুনি "নাট্যশাস্ত্র" নামে কোনও শাস্ত্র লেখেন নি, উপদেশও করেননি। সুতরাং, অপেক্ষাকৃত প্রাচীন গ্রন্থে "নাট্যশাস্ত্রকার ভরত" ইতি নামে উল্লেখ বা পরিচয় আশা করাই যায় না।** **কিন্তু,** ভরত নামে একজন মুনি, (যিনি নারদ নামে প্রপিতামহ ও ব্রহ্মা নামে পিতামহের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন) নাট্য বিষয়ে সুচিন্তিত উপদেশ করেছিলেন। **এই উপদেশগুলি সর্বপ্রথমে "সংগ্রহ" বা "সংগ্রহশাস্ত্র" নামে বিরচিত হয়েছিল। মতঙ্গ প্রণীত "বৃহদ্দেশী" নামে প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে ভরত ও ভরত-বচনের ভূরি উল্লেখ ও বৃহদাকৃতির উদাহরণ** (কোটেশন্) **আছে; কিন্তু—নাট্য শাস্ত্রের নামই নেই। আছে, "সংগ্রহ-শাস্ত্র" ইতি নাম।** অতএব "নাট্যশাস্ত্র" ইতি নামে গ্রন্থ বিরচনার বহু পূর্ব থেকেই ভরত ও সংগ্রহ-গ্রন্থের নাম **নাট্য-গান্ধর্ব সম্প্রদায়ের শ্রুতি গত ছিল।** বেদব্যাস বা বাল্মীকি মুনি নাট্য-গান্ধর্ব সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন না। **কিন্তু—মতঙ্গ গান্ধর্ববেত্তা ছিলেন।**

অতঃপর—উক্ত সংগ্রহ-শাস্ত্রের দ্বিতীয়বার সম্পাদন কল্পে "নাট্যশাস্ত্র" নামকরণ হয়েছিল। এর পরে ভরত মুনির খ্যাতি নাট্য-সঙ্গীত সমাজে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল।

এই হেতুতেই পূর্বোক্ত "কল্পনা-ভরত-বাদী" অনুবাদক বৃন্দের মতটি সরাসরি অগ্রাহ্য মনে করি। সুধী অনুশীলকবর্গের প্রতি নিবেদন এই যে—নিরপেক্ষ চিত্তে মতঙ্গ-প্রণীত "বৃহদ্দেশী" গ্রন্থখানি সাধারণ ভাবে পাঠ করে, পরে "কল্পনা-ভরত-বাদী" অনুবাদকবৃন্দের মতামত বিচার করুন।]

সূত্র-ভাষ্য জাতীয় কূট প্রবর্তনা দেখা দিয়েছে। তাহলেও অনুশীলন দ্বারা বুঝা যায়, অগ্র পশ্চাৎ ও পার্শ্বে, কখন দূরে কখনও বা নিকটে এর সন্ধানী দৃষ্টি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, নিকট অন্বয় এবং অতিদূরস্থ অন্বয়ের পরস্পর সংবাদ-বন্ধ (ক্রস্-রেফারেন্স্) দেখে মনে হয়—সংগ্রহ-শাস্ত্র "বারোয়ারী" রচনা হ'তেই পারে না। কারণ, "অনেক সম্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট" প্রবাদটি সত্য। অন্য পক্ষে, মাত্র এক ব্যক্তির রচনা মনে করতেও দ্বিধা বোধ হয়; কারণ, সেই ব্যক্তি অতুলনীয় ও অনন্যসাধারণ সূক্ষ্ম, ব্যাপক, ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন, বহুশ্রুত বহুবিশারদ নাট্য-গান্ধর্ব-সার্বভৌম শ্রেণীর ব্যক্তিই হবেন!

দৃষ্টান্তিত সংবাদ-বন্ধের একটি দৃষ্টান্ত করি।

যদি প্রশ্ন হয়,—গান্ধর্বোপযোগী বহু বাদনীয় যন্ত্রগুলির রক্ষণাবেক্ষণ তত্ত্বাবধান কার উপরে ন্যস্ত ছিল ? তদুত্তরে, কারিকা যথা—

শূরপতিস্তূর্যপতিঃ সর্বাতোদ্যবাদনে কুশলঃ।

তূর্যপরিগ্রহযুক্তো বিজ্ঞেয় তৌরিকো নামঃ ॥ ৭২ ॥ ৩৫ অঃ।

অর্থাৎ— তৌরিক নামে ব্যক্তিই বাদনীয় যন্ত্রসকলের তত্ত্বাবধায়ক হবেন। সর্ব আতোদ্য (তত, অবনদ্ধাদি বাদনীয় যন্ত্র, ২৮ অধ্যায় ১, ২ শ্লোক) বাদনে অভিজ্ঞ সেই তৌরিক। **তৌরিক নাম কি হেতু ?** তূর বা তূর্যবাদন-যন্ত্র সকলের ধ্বনির তীব্রতা ও বলের (ভলিউম্) কারণেই "তূর্য" বা "তূর" নাম। তৌরিক ব্যক্তি বিশেষ করে তূর্য-যন্ত্র সকলের নায়ক হবেন। তূর্য যথা, তূরি, ভেরি, পটহ, ডিণ্ডিম, দুন্দুভি গোমুখী বহু প্রকার শঙ্খ ও ঘন্টা মৃদঙ্গ এবং কাহল-তিত্তিরি শ্রেণীর যন্ত্র (ষ্ট্রামপেট্, বিউগল্)। **এত যন্ত্রও ছিল না কি! ছিল।** ৩৩ অধ্যায়ে বলা হয়েছে **"ত্রিপুষ্করাদ্যাণি"** অর্থাৎ মৃদঙ্গ, পণব, দর্দুর শ্রেণীকে আদ্য করে 'ঘন' শ্রেণী (করতাল, ঘন্টা, কাঁসী ইত্যাদি দ্বিতীয় শ্রেণী) এবং সুষির শ্রেণী (বংশ, বেণু ইত্যাদি তৃতীয় শ্রেণী) ইতি তিন শ্রেণীর বাদনীয় যন্ত্রের বিষয়ে "এতেষাং তু পুনর্ভেদাঃ শতসংখ্যা প্রকীর্তিতাঃ ॥" অর্থাৎ—এই তিনশ্রেণীর যন্ত্রগুলি ব্যক্তিগত বিভিন্ন-নাম-রূপতঃ একশত সংখ্যক যন্ত্র নাট্য-গান্ধর্বের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়েছে। **এত যন্ত্রের প্রয়োজন কি হেতু ?** রঙ্গদেবতা-পূজন অনুষ্ঠানে, পূর্বরঙ্গ অনুষ্ঠান মধ্যে, নাট্য-গান্ধর্বে এ সকলের বহুবিধ প্রয়োজন উপদিষ্ট হয়েছে, **যার মধ্যে সাধারণ প্রয়োজন হ'ল—নাট্যের অধীনে উৎসব, নৃপতি-বর্গের শোভা যাত্রা ও মঙ্গল-কর্মে, শুভ-কল্যাণযোগে, বিবাহাদি কর্মে, সংগ্রাম-কোলাহল পক্ষে,** এবং যে **কোনও বহুজনসমাগম পবিত্র অনুষ্ঠানের অভিনয় প্রয়োগে** এই সমস্ত যন্ত্রধ্বনি-যোগাযোগের প্রয়োজন (৩৩ অধ্যায়)। উক্ত তিনটি তূর্য শ্রেণীর যন্ত্রগুলির রক্ষণাবেক্ষণের ভার ন্যস্ত থাকে **তূর্য পতি তৌরিকের** উপর। **তূর্যপতি** কে? যিনি **রাজবাড়ীতে** তূর্য-যন্ত্র সকলের বিধান অনুষ্ঠানাদি নিয়ন্ত্রিত ও সাধিত করেন, তিনি তৎপদাভিষিক্ত ইতি তূর্যপতি। **রাজবাড়ীর লোকের সঙ্গে নাট্যানুষ্ঠানের যোগ কি নিমিত্ত ?** নাট্যকর্ম সমাপ্ত হ'লে, এতগুলি যন্ত্রকে শূন্য নাট্যগৃহে রাখা উচিত নয়, এবং এ নিমিত্ত দৈনন্দিন প্রহরীর ব্যবস্থাও অসম্ভব, কারণ, নাট্য প্রতিদিনের কর্ম নয়। অতএব, রাজকীয় তূর্যপতি এ সমস্ত যন্ত্রের দায়িত্ব নেন।* **রাজবাড়ীতেই** বা **তূর্যপতির প্রয়োজন কিরূপ ?** ৩৩ অধ্যায়ে উল্লিখিত, পূর্বোক্ত প্রয়োজন ত' আছেই, অধিকন্তু, প্রতি দিবা-রাত্রের

* কিন্তু, সেই তৌরিক বা তূর্যপতি পুরুষ বাঁশী, বিপঞ্চী, চিত্রা, ঘোষকা, কচ্ছপী শ্রেণীর তারের যন্ত্রের দায়িত্ব গ্রহণ করেন না। এ বিষয়ে, সেই সেই বিশিষ্ট যন্ত্রের বাদকই (বৈণিক, বৈপঞ্চীক ইত্যাদি উপাধি) নিজ নিজ যন্ত্র সঙ্গে নিয়ে ঘরে ফিরে যাবেন, ইতি সহজ-বুদ্ধির কথা।

প্রহর-সংকেত নিয়ন্ত্রণ, বৈতালিক-ব্যবস্থা, আকস্মিক ভয়-উৎপাত-বিপদের নির্মিত-সূচনা, ইত্যাদি করণীয় ব্যাপারের প্রয়োজনে বেতনভুক্ ভূর্যপতি (ইং ব্যাণ্ড মাস্টার) রাজার পক্ষে পালনীয়। নাট্যানুষ্ঠান রাজানুগৃহীত বলেই, রাজার আদেশে তূর্যপতি পুরুষ নাট্যসংশ্লিষ্ট যন্ত্রাদির রক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। **তাহ'লে শূরপতি কে ?** তূর্যপতি অধিকন্তু শূরপতি! শূর অর্থে সিংহ; লক্ষণার্থে—রাজ পালিত সিংহ-মৃগাদি পশু। **রাজবাড়ীতেও কি চিড়িয়াখানা থাকত ?** যদি রাজা অশোকের পক্ষে পশু-পক্ষী প্রভৃতি প্রাণীবর্গের চিকিৎসা-ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছিল বিশ্বাস করতে হয়, তাহ'লে বুঝতে হবে, রাজা চিড়িয়াখানা পালন করতেন; নচেৎ—বনে বনে ঘুরে রোগ-কাতর সিংহ-মৃগ-পশু-পক্ষী ধরে নিয়ে এসে চিকিৎসা করা হ'ত, মনেই করা যায় না। **তূর্যপতি ও শূরপতি একই ব্যক্তি হ'লে রাজার সুবিধা হ'ক বা না হ'ক, নাট্যানুষ্ঠানের কি সুবিধা হ'ত ?** শূরপতি পশু পক্ষীঘটিত যাবতীয় চরিত্র-বৈশিষ্ট্য বিষয়ে অভিজ্ঞ, এমন কি বিশারদ ব্যক্তি। পশু-পক্ষিদের স্বর বৈশিষ্ট্য গতি-ভঙ্গি বৈশিষ্ট্য বিষয়ে যদি কোনও ব্যক্তির বিশারদতা সম্ভব হয় ত' একমাত্র শূরপতির পক্ষেই সম্ভব। এখন, কথা এই যে, ৩৫ অধ্যায়ে **১ শ্লোকে** (এবং ১৪ শ্লোক পর্যন্ত স্তরে) **নাট্যভূমিকায়** (বিশেষ করে, নাটক, প্রকরণ ও সমবকার শ্রেণীর) **প্রযোজ্যা মনুষ্যেতর প্রাণীর অভিনয় প্রসঙ্গে** অতি **উত্তম সারগর্ভ প্রয়োগোচিত উপদেশ আছে।** যথা নাটকীয় গরুড়, বা সম্পাতি বা জটায়ু বা উচ্চৈঃশ্রবা বা অপর ভূমিকা। যে স্থলে পশু-পক্ষির স্বর, গতি-ভঙ্গি অনুকরণীয়, সে স্থলে অভিনয়-কর্ম কোন্ অভিজ্ঞ ব্যক্তি শিক্ষা দেবেন ? যে স্থলে উৎসারিত-বাদ্য বা মার্গোৎসারিত বাদ্যের * (ব্যাক্ গ্রাউণ্ড মিউজিক, "আবহ-সঙ্গীত" ইতি আধুনিক) দ্বারা পশু-পক্ষিদের স্বর-কলরবের সহযোগ নিষ্পাদনীয়—সে স্থলেই বা কোন্ অভিজ্ঞ পুরুষ শিক্ষা দেবেন ? এর একমাত্র উত্তর ও ব্যবস্থা উপদিষ্ট হয়েছে "শূরপতিঃ তূর্যপতিঃ সর্বাতোদ্যবাদনে কুশলঃ।" ইতি বাক্যের মধ্যে। রাজকীয় পশু-শালার তত্ত্বাবধায়ক শূরপতি স্বয়ং তূর্যপতি এবং চারপ্রকার যন্ত্রবাদনে অভ্যস্ত। উক্ত গুণলক্ষণ-সম্পন্ন পুরুষ জানেন কোন্ কোন্ বাদ্যধ্বনির সমাযোগে কোন্ কোন নাটকীয় পশু-পক্ষীর কণ্ঠস্বরের অনুকরণীয়, কিরূপ অবনদ্ধ যন্ত্র (যথা পটহ, দুন্দুভি) সমাযোগে সিংহনিনাদ ও মেঘ গর্জন অনুকরণীয়। এই সমস্ত **লীলাকৃতং** (২৯ অধ্যায় ১১৭ শ্লোক) বাদিত্রপ্রয়োগ-রহস্য উক্ত গুণলক্ষণসম্পন্ন "তৌরিক" ব্যক্তির জ্ঞাত, সুতরাং তিনি নাট্যপ্রয়োগকালে 'তূর্যপরিগ্রহযুক্ত' অর্থাৎ তূর্যধ্বনিনিষ্পাদক আতোদ্যসকলের আয়ত্তি সম্পন্ন হয়ে, যথাযোগ্য করণীয় সকল নিষ্পাদিত করেন। **এক কথায় তৌরিক পুরুষ সর্ববিধ আতোদ্যের রক্ষণাবেক্ষণকারী, তূর্যধ্বনিপ্রয়োগ বিশেষজ্ঞ সর্ববিধ আতোদ্য বাদনে কুশলী, রাজকীয় তূর্যপতি ও শূরপতি, এবং এক কথায়। নাট্য ব্যাপারে অ্যানিম্যাল্ মিউজিক প্রোডিউসার—ডাইরেক্টর।**

যথার্থত, ও নিঃশেষে এই শ্লোকের সমাক অর্থ ও ইঙ্গিত উদ্ধার করতে হ'লে, একাদিক্রমে ১৯ অধ্যায়ে পাঠ্যযোগাধিকৃত "স্বরাঃ" প্রসঙ্গ, ২৩ অধ্যায়ে রূপ-বর্তনা প্রসঙ্গ (৮০ থেকে ৮৭ শ্লোক), ২৪ অধ্যায়ে সত্ত্ব-শীল প্রসঙ্গ (৯৪ থেকে ১৩৫ শ্লোক), ২৯ অধ্যায়ে বাদিত্র-করণ ও বহির্গীত প্রসঙ্গ, এবং ৩৩ অধ্যায়ে ১২ শ্লোক থেকে ৩৩ শ্লোক পর্যন্ত বাদ্য-যোগ প্রসঙ্গ,—ধীরভাবে অনুধাবনীয় ও অনুশীলনীয়। নচেৎ, নাট্যশাস্ত্র ইতি বারোয়ারী রচনার মধ্যে এই শ্লোকটি এক টেরে পড়ে আছে, থাকুক, কোনও ইয়ার-দোস্তের খাতিরেই বোধ হয় একে জায়গা

* ২৯ অধ্যায়ে, ১১৫ শ্লোক থেকে ১৪৮ শ্লোক পর্যন্ত স্তরে বহির্গীত আসারিতাদি বিষয়ে উপদেশ দ্রষ্টব্য।

দেওয়া হয়েছিল! আর ঐ "শূরপতি" ত' চৌদ্দ শাকের মধ্যে ওলের ডগা!

প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হ'তে পারে, মাত্র বাদ্যধ্বনির যোগে কি পশু-পক্ষীর নিনাদ-কলরব অনুকরণ করা সম্ভব? উত্তরে বলা যায়, **অবশ্যই সম্ভব। এর উৎকৃষ্ট একটি নিদর্শন এখনও বর্তমান।** গ্রামোফোন রেকর্ডে ভাগনার রচিত "রাইড্ অব্ দি ভাল্কাইরিজ্" সিমফনি মিউজিক শুনতে অনুরোধ করি প্রশ্নকর্তাকে। তিনি কানে শুনতে পাবেন,—তুরঙ্গম পৃষ্ঠে দিব্য প্রমীলাগণ বার বার সুদূর আকাশের সীমায় স্বর্গলোক থেকে অদ্ভুত গতি-বেগে নেমে আসছেন; শ্রোতার নাকের ডগার সামনে দিয়ে এক দল নেমে গেলেন মর্ত্যলোকের নিম্নভূমিতে; তাদের বিচিত্র উল্লাসধ্বনি ভেদ করে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে সেই দেব-তুরঙ্গমদের হ্রেষা-রব, আর বিজাতীয় নাসিকা-নিঃস্বন, আর ক্ষুর-সংঘর্ষের রুক্ষ খেটধ্বনি! বার বার যতো বার সেই প্রমীলা দেবীরা মর্ত্য থেকে উঠে আসছেন সংগ্রামনিহত বীরপুরুষদের আত্মাকে বাহুসমপুটে বন্ধ করে, ততোবারই তুরঙ্গমদের ধ্বনি ক্রমশ শ্রোতার নিকটবর্তী ও তীব্রতর হয়ে উঠছে, একবার এত নিকটে এসে গেল যে আমি ভয়ে সম্ভ্রমে আসনে একটু পিছু ঠেলে বসলাম! **পাশে একটি পোষা বিড়াল শুয়ে ছিল।** ফিরতি পথে তুরঙ্গমদের এতখানি সান্নিধ্য সে সহ্য করতে পারল না! হক্চকিয়ে উঠে এক লাফে জানালা দিয়ে বার হয়ে গেল! তিন মিনিট মাত্র সময়ের মধ্যে আকাশের দিক্-বিদিক্ থেকে আসেন প্রমীলার দল, বার বার; তাঁদের গমনাগমন সংকেত ফুটে উঠে সমুজ্জ্বল ধ্বনি-তরঙ্গ বয়ে। সেই হ্রেষারব ও ক্ষুরধ্বনির সঙ্গে মিলে একাকার হয়ে যায় একটি আশ্চর্য কোলাহল যার সঙ্গে কোনও পার্থিব পরিকল্পনার তুলনা করতে পারেনি আজ পর্যন্ত।. .ভাগ্নার অতুলনীয়। অতিমানুষিক, এমন কি অমানুষিক অপার্থিব শৌর্য বীর্য উৎসাহ ও ভয়ানকের পূজারী ছিলেন তিনি। তিনি পূজা করেছেন ধ্বনি-বৈচিত্র্য আর ধ্বনি সৌন্দর্যের ফুল-বিল্বপত্র দিয়ে।

নাট্যশাস্ত্রের রচনার মধ্যে ভাবাবেগ বা উচ্ছ্বাস নেই বললেই হয়। সন্দেহ স্থলে পরীক্ষা করে দেখা যায়, আপাতদৃষ্টিতে আবেগ বা উচ্ছ্বাসের অন্তস্থলে আবশ্যকীয় প্রয়োগবিধি বর্তমান।

"ছন্দোবিচিতি" নামে ১৬ অধ্যায়টি আদ্যোপান্ত ছন্দ ও ছন্দোবন্ধ কবিতারচনার নিদর্শন দিয়ে পূর্ণ। ছন্দের নামগুলি যথা—তনুমধ্যা, মকরকশীর্ষা, মালিনী, উদ্ধতা, ভ্রমরমালিকা সিংহলীলা, মত্তচেষ্টিতা, বিদ্যুল্লেখা, মধুকরী, উৎপলমালিনী, শিখিসারিণী (ময়ূরসারিণী), দোধক, মোটক, ইন্দ্রবজ্রা, উপেন্দ্রবজ্রা, রথোদ্ধতা, স্বাগতা, শালিনী, তোটক, কুমুদনিভা, ইন্দ্রলেখা, প্রমিতাক্ষরা, জগতী, হরিণপ্লুতা, কামমত্তা, অপ্রমেয়া, পদ্মিনী, পুটবৃত্ত, প্রভাবতী, প্রহর্ষণী, মত্তময়ূরক, বসন্ততিলক, অসংবাধা, শরভা, নান্দীমুখী, গজবিলসিত, প্রবরললিত, শিখরিণী, বৃষভললিত, শ্রীধরা, বংশপত্রপতিত, বিলম্বিতগতি, চিত্রলেখা, শার্দূলবিক্রীড়িত, সুবদনা, স্রগ্ধরা, মদ্রক, অশ্বললিত, মেঘমালা, ক্রৌঞ্চপদা, ভুজঙ্গবিজৃম্ভিত, ও দণ্ডক—ইতি বাহান্নটি সমবৃত্ত ছন্দ। এতদ্ব্যতীত বিষমবৃত্ত ও অসমবৃত্ত ছন্দোভেদের বহু উদাহরণ আছে। অতঃপর, আর্যজাতীয় ছন্দোভেদ সকল বর্ণিত হয়েছে।

ছন্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

এবমেতানি বৃত্তানি সমানি বিষমাণি চ।
নাটকাদিষু কাব্যেষু প্রযোক্তব্যানি সূরিভিঃ ॥ ১৪৮ ॥ ১৬ অঃ।

অর্থাৎ—এই সকল সম ও বিষম বৃত্তকে বিদ্বান (কবিগণ) নাটকাদি কাব্যবন্ধ রচনায় প্রয়োগ করবেন।

প্রশ্ন হ'তে পারে, উল্লিখিত বৃত্তগুলির অতিরিক্ত অপর বহু বৃত্ত সকলও কি প্রয়োগ-

যোগ্য? উত্তরে বলা হয়েছে—

সন্ত্যন্যান্যপি বৃত্তানি যান্যুক্তানীহ পণ্ডিতৈঃ।
ন চ তানি প্রযোজ্যানি ন শোভাং জনয়ন্তি যৎ ॥ ১৪৯ ॥ ১৬ অঃ।

অর্থ। পণ্ডিতগণ অন্যান্য বৃত্তেরও প্রসঙ্গ করেন। যেহেতু সে সকল বৃত্ত (কাব্যবন্ধ ও নাট্যের) শোভা সৃষ্টি করে না অতএব, সেগুলি প্রয়োগ করা উচিত নয়।

প্রকারান্তরে বলা হ'ল—কবিজন বা ছন্দোবিদ্ ব্যক্তিগণের রচিত সর্ব ছন্দই শোভাজনক হয় না। যেমন, সমস্ত ফুলই স্বভাবসৌন্দর্যেভূষিত নয়। বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারি-ভাব সকলের সমাবেশ গুণে হয় কাব্যের ভাব-শোভনীয়তা। অক্ষর-সমাবেশ-বৈশিষ্ট্যের গুণে হয় ছন্দের শোভাজনকত্ব। ফল কথা, কাব্যের ভাব ও ছন্দ উভয়ই মনোরম হওয়া বাঞ্ছনীয়। **উত্তম কাব্য রচনায় ঐ দু'টি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য হয়।** মধ্যম রচনায়, মাত্র ভাব-সম্পদ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য হয়; ছন্দের রমণীয়তা-বিশেষ লক্ষ্য হয় না। এবং অধম কাব্যে, ঐ দুই বৈশিষ্ট্যের একটিও লক্ষ্য হয় না; লক্ষ্য হয় মাত্র ভাব-সাধারণ্য ও ছন্দ-কৌতুক। এ স্থলে অবশ্য ছন্দোবন্ধ কাব্যেরই প্রসঙ্গ।

নাটক, প্রকরণ প্রভৃতি কাব্যবন্ধের রচনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংলাপের অবকাশের মধ্যে ছন্দোবন্ধ উত্তম কবিতার প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়। এরূপ কবিতা প্রয়োগের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

যান্যতঃ পরমত্র স্যুর্গীতকৈ স্তানি যোজয়েৎ।
ধ্রুবাবিধানে ব্যাখ্যাস্যে তেষাঞ্চৈব বিকল্পনম্ ॥ ১৫০ ॥ ১৬ অঃ।

অর্থ। অতঃপর, এ স্থলে যে সকল ছন্দাবিহিত হয়েছে, সেগুলি 'গীতক' নামে গানের সঙ্গে যোজনা করা উচিত। উক্ত (গীতক-ছন্দ) সকলের বিষয়ে বিশিষ্ট পরিকল্পনা আমি ধ্রুবাবিধান ঘটিত উপদেশ প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করব।

তাৎপর্য। এই প্রতিশ্রুতি পালিত হয়েছে। সংস্কৃত কবিতাকে গীতক-ছন্দে রূপান্তর করার পক্ষে সাধারণ বিধি হ'ল—সেই কবিতা প্রাকৃত-ভাষায় রূপান্তরিত করে গীতানুযায়ী সুর ও ছন্দ যোজনা কর্তব্য।

দুই সংস্করণেই এমন কিছু শ্লোক গ্রথিত আছে, যার অর্থ উদ্ধার করা আমার দৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হয়েছে। গান্ধর্ব-সংগ্রহের মধ্যেই এর কিছু আধিক্য আছে। সন্দেহ হয়, শ্লোকগুলি কিছু রহস্য বা সংকেত বহন করে। প্রাচীন মিশর ও ব্যাবিলনের লিপি-সংকেত যখন উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, তখন নাট্যশাস্ত্রের এই ব্যাস-কূটগুলির অর্থ উদ্ধার করাও সম্ভব হবে; **কালে ও দেশে।** অর্থাৎ যে কালে ও যে দেশে অধ্যবসায়ী অনুশীলক এ রকম কার্যকে জীবনের ব্রত রূপে স্বীকার করে কার্যে প্রবৃত্ত হবেন, **সেই কালে ও সেই দেশের** কল্পনা করছি আমি।

নাট্যশাস্ত্রের সমগ্রত একবার পাঠ ও ভাবার্থ গ্রহণ করলে মনে হয়, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও শিল্পনিদর্শনের বিরাট এক অক্ষৌহিনী সংগ্রহ-সম্পদ বুকে পিঠে, মাথায় ধারণ করে ধীর অথচ নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে এসেছিল; প্রাচীনতর কাল থেকে ভরতের আবির্ভাব কাল পর্যন্ত। **জ্ঞান বিজ্ঞান ও নিশ্চিত অভিজ্ঞতা যদি মানবীয় সম্পদের মধ্যে সর্বোত্তম মন্য হয়, তাহলে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিনিধিরূপে নাট্যশাস্ত্রের তুল্য একখানি গ্রন্থও নেই।** পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য, মহাকাব্য ও দর্শন-শাস্ত্র সকল একত্রিত করেও দেখা যায়—তর্ক-সংশয়সমাকুল জ্ঞান, অপরীক্ষণীয় বিজ্ঞান, ও অনিশ্চিত অভিজ্ঞতাই স্তূপীকৃত হয়েছে।

নাট্যশাস্ত্ররূপ অক্ষৌহিনী তার যাত্রাপথে সর্বকালের ও সর্বদেশের গ্রাহ্য, প্রয়োজনীয় ও উপাদেয় জ্ঞান-বস্তু আহরণ করেছিল। অধিকন্তু, এবং আশ্চর্যের কথা এই যে—ভবিষ্যৎকালেও অভিনব বস্তুর আহরণ ও সংগ্রহ বিষয়ে এর বিমুখতা নেই, বরং এ রকম কার্যের সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট উপদেশ আছে। নিম্নলিখিত শ্লোক সকল উদাহরণের যোগ্য।

১৩ অধ্যায়ে ১৫৬-১৫৭ শ্লোক—

এবমেতা প্রযোক্তব্যা নরাণাং গতয়ো বুধৈঃ ॥ ১৫৬ ॥
নোক্তাশ্চ যা ময়া হ্যত্র গ্রাহ্যাস্তা অপি লোকতঃ।

প্রসঙ্গ হ'ল—মানুষের গতি অর্থাৎ গমনকার্যের অভিনয়। ভরত মুনি বলেছেন, তিনি যে সকল সম্ভাব্য (ভিন্ন দেশে ও কালে) গতি-ভঙ্গির কথা উপদেশ করলেন না, সে সকল অনুক্ত গতিক্রিয়া তত্তদ্দেশীয় ও তত্তৎকালীন **লোকপ্রত্যক্ষ** থেকে আহরণীয় ও গ্রহণীয়।

পুনরায়, ঐ অধ্যায়ে সর্বশেষ শ্লোক—

গতিপ্রচারস্তু ময়োদিতোঽয়ং, **নোক্তশ্চ যঃ সোঽর্থবশেন সাধ্যঃ।** ইত্যাদি। অর্থাৎ—প্রয়োগযোগ্য গতি-প্রচার (আবর্তিত গতি) উপদেশ করেছি। যা আমি বলিনি, তাও গ্রহণযোগ্য হ'তে পারে, কিন্তু—উদ্দেশ্যবশেই গ্রহণ ও প্রয়োগ করা উচিত।

প্রথম চরণে 'তু' শব্দের তাৎপর্য আছে। 'গতি' ইতি লোকসাধারণ গতি। গতি-প্রচার হ'ল সেই লোকেরই অনুষ্ঠান বিশেষে চেষ্টিত ও আবর্তন-যুক্ত গতি। পূর্বোক্ত শ্লোকে যে লোকগ্রাহ্যত্ব উপদেশ করা হয়েছে, **সেই লোক হ'ল সর্বকালে সম্ভব** সাধারণ লোক। সম্প্রতি 'তু' শব্দের তাৎপর্য এই যে—ভরতের কালে অপর নাট্যসম্প্রদায় ছিল; এবং গতি-প্রচার বিষয়ে বিভিন্ন উপদেশও ছিল। ভরতের বক্তব্য এই যে—অন্যান্য সম্প্রদায় অন্য নানাপ্রকার গতি-প্রচারে শিক্ষা দিয়ে থাকেন, যার আমি উল্লেখ করিনি। কিন্তু, এই অনুক্ত বস্তুও গ্রহণ করা যেতে পারে, যদি "অর্থবশেন সাধ্য" হয়, অর্থাৎ তাৎকালিক **উদ্দেশ্যের সহায়ক** রূপে, অথবা **উদ্দেশ্যের অবিরোধে** সেই বস্তু গ্রহণ করা সম্ভব হয়। **এই শ্লোকটি দ্বিরুক্তি নয়।**

একটি অবান্তর প্রশ্ন হয়। হস্ত ও অপরাপর অঙ্গ-কর্মের প্রসঙ্গে **অনুক্ত-গ্রাহ্যতার** উপদেশ নেই। অথচ, গতি ও গতিপ্রচার প্রসঙ্গে বার বার দু'বার **অনুক্ত-গ্রাহ্যতা** উপদিষ্ট হ'ল। এরই বা হেতু কি?

হেতু এই যে—**গাত্রবিক্ষেপ** ও **গতির** মধ্যে পার্থক্য আছে। **স্থানান্তর প্রাপ্তি না হ'লে গতি হয় না।** আবার, স্থানান্তর-প্রাপ্তি না হয়েও অন্যান্য অঙ্গের বিক্ষেপ হ'তে পারে। গাত্র-বিক্ষেপ ও গতির মধ্যে অবিনাভাব সম্বন্ধ নেই। ফলে, হস্তাদি অপর কর্মসকল সংখ্যানিয়ত; অনন্ত সম্ভাবনাযুক্ত নয়। কিন্তু—পাদ কর্ম ও গতিপ্রচার দ্বারা স্থানান্তর সিদ্ধির অসংখ্য ভেদ। **অতএব—গতি ও গতি-প্রচার বিষয়ে উক্ত উপদেশ দু'টি সার্থক;** কিন্তু হস্তাদি **কর্ম** পক্ষে নয়।

১৮ অধ্যায়ে **নাটকীয়** ভাষার প্রসঙ্গ। ৪৮ ও ৪৯ শ্লোক যথা—

এবং ভাষাবিধানন্তু কর্তব্যং নাটকাশ্রয়ম্ ॥ ৪৮ ॥
অথ নোক্তং ময়া যচ্চ লোকাৎ গ্রাহ্যং বুধৈস্তু তৎ ॥ ৪৯ ॥

ভাষা অর্থাৎ লোকভাষা। 'নাটক' অর্থে নাট্য নয়। **দশ রূপ কাব্যবন্ধের উৎকৃষ্ট রচনা** হ'ল নাটক, যথা 'মৃচ্ছকটীক' ও 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্'। ভাষা দেশকালগত ভেদে অসংখ্য। নাট্য-বিবুধগণ উদ্দেশ্য বিচার করে, অনুক্ত-বিধান ভাষাও প্রয়োগ করবেন। **লোকসিদ্ধিই হবে অনুকূল প্রমাণ।**

২৩ অধ্যায়ে আহার্য (মুকুট-কুন্তল-বেশাদি) অভিনয়ের প্রসঙ্গ। শেষে ২১৪ শ্লোক—

এবং নানাপ্রকারৈস্তু আয়ুধাভরণানি চ
নোক্তানি চ ময়া যানি লোকগ্রাহ্যাণি তান্যপি ॥ ২১৪ ॥

দেশকালপাত্র ভেদে অস্ত্র আভরণ প্রভৃতিরও অসংখ্য ভেদ। অনুক্ত বস্তুর গ্রহণ অবশ্য কর্তব্য, উদ্দেশ্যবশে। লোকসিদ্ধিই প্রমাণ; ন তু শাস্ত্র সিদ্ধি।

২৬ অধ্যায়ে **চিত্রাভিনয়** (বিচিত্র বস্তু সকলের যোগে অভিনয়) প্রসঙ্গ। ১১১ শ্লোক যথা—নাট্য প্রয়োগ প্রসঙ্গে।

নোক্তা যে চ ময়া তত্র **লোকগ্রাহ্যাস্তু তে বুধৈঃ।**
লোকো বেদা স্তথাধ্যাত্মং প্রমাণং ত্রিবিধং স্মৃতম্ ॥ ১১১ ॥

এ স্থলে "যে" অর্থ চিত্রাভিনয় অধিকারে বাচিক ও আঙ্গিক অভিনয়ের বিচিত্র প্রয়োগ সকল। ভাবার্থ। যেগুলি উপদেশ করা হয় নি, (বহু বহু বাগঙ্গাভিনয়) সেগুলি লোকযাত্রা সিদ্ধ রূপে আহরণীয়। **'তু' অর্থাৎ কিন্তু**—বস্তু লক্ষণবিশারদ নাট্যবিবুধগণ, ত্রিবিধ প্রমাণের কষ্টি-পাথরে সেই অনুক্ত বস্তু যাচাই করবেন। প্রমাণত্রয় যথা—লোক প্রমাণ, শাস্ত্র প্রমাণ ও অধ্যাত্ম প্রমাণ। "এই বস্তু বা কর্ম লোকে সিদ্ধ" **ইতি লোক-প্রত্যক্ষ প্রমাণ।*** লোকপ্রমাণই গ্রহণপক্ষে মূল কথা। অতঃপর—সেই বস্তু শাস্ত্রসিদ্ধ কি না। যদি শাস্ত্র সিদ্ধ হয়, তাহ'লে আর কথাই নেই। কিন্তু—যদি সেই বস্তু বা কর্ম শাস্ত্র বাক্য বা নিদর্শনের বহির্ভূত হয় (যথা, চেয়ার, টেবল, গ্লাস্, সিগারেট পান ইত্যাদি) তাহ'লে সেই লোকপ্রমাণ-সিদ্ধ বস্তু বা কর্মকে অধ্যাত্মের কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখতে হবে, সুন্দর কি অসুন্দর, সঙ্গত, কি অসঙ্গত। অধ্যাত্ম প্রমাণ কিছু সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার নয়। মন এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়বর্গ মিলে যে সুন্দর-অসুন্দর, সঙ্গত-অসঙ্গতের ত্যাজ্য-গ্রাহ্য বিচার করে, সেই বিচারই অধ্যাত্মগত। **অবশ্যই বিবুধ ব্যক্তিই এই তিনটি প্রমাণ দ্বারা সাধ্যাসাধ্য নির্ণয় করবেন; পথচলতি লোক নয়।**

৩৪ অধ্যায়ে বাদ্য-বিধি প্রসঙ্গ। ২৬৮ শ্লোক যথা—

এতৎ সর্বং নাট্যযোগং সমীক্ষ্য, প্রোক্তং বাদ্যং সর্বলোকানুমানাৎ।
নোক্তং যচ্চেদাগমাচ্ছাস্ত্রবুদ্ধ্যা সদ্ভিঃ কার্যং মার্গজাতীঃ সমীক্ষ্য ॥

ভাবার্থ। সর্বলোক প্রত্যক্ষপূর্বক যে অনুমান সম্ভব, সেই অনুমান হেতুতে, এই সমস্ত নাট্য-প্রয়োগ বিচার করে, বাদ্যবিধি উপদেশ করা হ'ল। সুতরাং—সম্প্রতি লোক ও অনুমান (অধ্যাত্ম) উভয়ই অবলম্বিত হয়েছে। এতৎ সত্ত্বেও হয়ত কিছু অনুক্ত আছে। সেই অনুক্ত বাদ্যপ্রয়োগ-বিধি **আগমহেতুতে গ্রহণীয়।** এবং সন্নাট্য প্রযোক্তাগণ বাদ্যপ্রয়োগের মার্গ ও জাতিসকল বিচার-পূর্বক শাস্ত্রবুদ্ধি দ্বারা প্রয়োগকার্যে প্রবৃত্ত হবেন।

'আগমাৎ' অর্থ আগম হেতুতে। আগম অর্থাৎ গুর্বাচার-সিদ্ধি বা নিশ্চয়াত্মিকা শ্রুতি। লোকেও অপ্রত্যক্ষ অধ্যাত্ম দ্বারাও গ্রাহ্য নয়, অথচ গুর্বাচার-সিদ্ধ বস্তু বা কর্মই আগম।

---

* লোকপ্রমাণ—লোকযাত্রা, লোকবার্তা, লোকনীতি, লৌকিক বস্তু ও লোকধর্ম ইতি পাঁচটি। লোকধর্ম যথা—আফ্রিকা দেশের অধিবাসী বিশেষের লোকধর্ম এই যে—কোনও বধূ ভাসুরের ছায়ার সংস্পর্শে এলে তৎক্ষণাৎ বধ-বন্ধনাদি শাসনের যোগ্য। ভারতের লোক বিশেষে চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের কালে উলু দেওয়া, শঙ্খধ্বনি করা, হাঁড়ি-ফেলা ইত্যাদি শাস্ত্রবিবর্জিত কর্ম লোকধর্ম।

যথা—গন্ধর্বাপ্সরোগণ আকাশ* পথে বা মেঘলোকে গীতনৃত্ত করতে করতে ক্রমশ মর্ত্যলোকে অবতরণ করছেন। এরূপ শ্রব্য-দৃশ্য অভিনয়ের সঙ্গে বাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। কিরূপ প্রমাণ বলে ?

গন্ধর্বাদিগণের আকাশে গমন প্রত্যক্ষ সিদ্ধ নয়, অনুমানসাধ্যও নয়। কিন্তু—**নাট্য-গান্ধর্বের গর্ব্বাচারসিদ্ধ এ পক্ষে আগম প্রমাণ।** নাট্যশাস্ত্রে দেব-দিব্যগণের রূপ-গুণ-লক্ষণ, সত্ত্ব, ও গতি-চারীর প্রসঙ্গ আছে। **কিন্তু নাট্যশাস্ত্রে আছে বলেই যে এতৎ সমস্ত শাস্ত্রসিদ্ধ, তা নয়। এগুলি বস্তুত, গর্ব্বাচারসিদ্ধ শ্রুতি।**

অতঃপর, উপদেশ এই যে—নাট্যপ্রযোজ্য মার্গ (৩৪ অঃ চতুর্মার্গ) ও জাতি (গান্ধর্বের অষ্টাদশ জাতি) সমীকরণ করে শাস্ত্রবুদ্ধির অনুগত হয়ে এরূপ দৃশ্যে বাদ্যপ্রয়োগ করবেন। নাট্যশাস্ত্রের (চৌ-সং) সর্বশেষ শ্লোকার্দ্ধ—

এবং নাট্যপ্রযোগে বহূ বহূ বিহিতং কর্ম শাস্ত্রপ্রণীতম্।
ন প্রোক্তং যচ্চ লোকাদনকৃতিকরণং তচ্চ কার্যং বিধিজ্ঞৈঃ॥

অর্থাৎ—এই রূপে নাট্যপ্রয়োগ বিষয়ে বহু বহু শাস্ত্রপ্রণীত (শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা প্রকৃষ্ট রূপে নীত, চালিত) কর্ম বিহিত হয়েছে। যা বিশিষ্ট রূপে কথিত হয়নি, বিধিজ্ঞ ব্যক্তিরা লোকপ্রত্যক্ষ হেতুতে অনুকৃতি-করণ রূপে সেই অনুপদিষ্টও প্রয়োগ করবেন।

"অনুকরণ" অর্থ অভিনয়কর্ম দ্বারা সদৃশ কর্ম নিষ্পাদন করা। অনুকৃতি-করণ অর্থাৎ যে বস্তু তদ্রূপে নাট্যে প্রযোজ্য নয়, তৎসদৃশ কোনও বস্তুর কৃত্রিম নির্মাণ ও প্রয়োগ। যথা—চন্দ্র, তারা, পর্বত, বৃক্ষাদি নাট্য ব্যাপারে অনুকৃতি রূপেই প্রযোজ্য।

সংগ্রহ-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য বুঝলে রচনারও লক্ষ্য বুঝতে পারা যায়। **সংগ্রহ-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য কি নয়,** সেইটেই আগে পরিষ্কার করা উচিত।

যাঁরা গীত, বাদ্য, নৃত্য, নৃত্ত, ও অভিনয় **শিক্ষা করতে ইচ্ছা করেন, তাঁদেরকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে সংগ্রহ-শাস্ত্র রচিত হয়নি।** তাঁরা গুরুমুখী পদ্ধতিতে গুরুর কাছে বসে শিক্ষা করবেন।

যাঁরা মাত্র কৃতানুকরণ, বা পরানুকরণ সম্বল করে নাট্যগান্ধর্বোপযোগী বিবিধ চারুকলা ও কারুকর্মকে জীবিকা রূপে গ্রহণ করেন, তাঁদের নিমিত্তও সংগ্রহ-শাস্ত্র রচিত হয়নি।

বরং বলা যায়—সূত্রধার, আচার্য, পারিপার্শ্বিক, প্রয়োগী, প্রেক্ষক ও প্রাশ্নিক শ্রেণীর জ্ঞান-কর্মবিশারদ ব্যক্তিগণের পরিকল্পনা ও প্রয়োগ কর্মের উত্তম অবলম্বন রূপে সংগ্রহ-শাস্ত্র প্রণীত হয়েছিল। অর্থাৎ—ইংরাজি অনুবাদ করে বলতে হয়, আধুনিক ডাইরেক্টর, প্রোডিউসার, ক্রিটিক ও অ্যাড্‌ভাইজরি বডি শ্রেণীর বিশেষজ্ঞদের কর্মের সুযোগ ও জ্ঞানের সঞ্চারতা সাধনের সহায়তা করার উদ্দেশ্যেই সংগ্রহ-শাস্ত্র বিরচিত হয়েছিল।

রচনার দুরূহতা ও মধ্যে মধ্যে জটিল ভাব-ভঙ্গি অনুধাবন করলে উক্ত মন্তব্যের যথার্থতায় সন্দেহ হয় না। রচনার বা উপদেশের স্থানে স্থানে "ভরত" নামে সম্বোধন প্রয়োগ আছে। **এই "ভরত" অর্থে নট-নর্তী হতেই পারে না।** সংগ্রহ-শাস্ত্রের উপদেশ শ্রবণ মাত্রে অর্থ গ্রহণ করার ক্ষমতা নট-নর্তীদের পক্ষে সম্ভবই নয়। 'ভরত' অর্থে সূত্রধার-প্রমুখ উচ্চ স্তরের জ্ঞানী ও

* আকাশে মেঘপুঞ্জের অন্তরালে বা অবকাশে গন্ধর্বাদিগণের ভূমিকা প্রয়োগ, আকাশচারী, সংগ্রাম প্রভৃতি দৃশ্যশ্রব্য বস্তু নিষ্পাদন করা নাট্যশিল্প-কৌশলের পক্ষে আদৌ অসম্ভব ছিল না, এবং এখনও অসম্ভব নয়।

প্রয়োগী ব্যক্তিবর্গ। এবং—"সূত্রধার লক্ষণ" বর্ণনায় সূত্রধারকে "পণ্যাভিধান" বিশেষণ দিয়ে বিশেষিত করা হয়েছে বলে অনুমান হয়—**সূত্রধারই 'ভরত' নাম বা উপাধি যোগ্য ব্যক্তি।** ইনি সাক্ষাৎ ভরত মুনিরই প্রতিনিধি। 'ভরত' নাম যেমন পণ্যবান্, সূত্রধার-ইতি-ভরতও সেরকম পণ্যনাম।

প্রকারান্তরে বলা যায়, যেহেতু সূত্রধারপ্রমুখ উক্ত ব্যক্তিবর্গ শকার, বিদূষক, চেট, গণিকাদি ব্যক্তিবর্গকে এবং বীথ্যাদি আতোদ্যবাদক শিল্পী ব্যক্তিবর্গকে যথাক্রমে নাট্য ও গান্ধর্বের যাবতীয় কর্ম শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করেন, **অতএব, যাঁরা শিক্ষণ-বিদ্যা-পদ্ধতি বিষয়ে অভিজ্ঞ ও বিশারদ হতে ইচ্ছা করেন তাঁদেরই নিমিত্ত সংগ্রহ-শাস্ত্র বিরচিত হয়েছিল। অর্থাৎ—নাট্য ও গান্ধর্ব বিষয়ে "টিচার্স্ ট্রেনিং কোর্স" পক্ষে সংগ্রহ-শাস্ত্রই ছিল উৎকৃষ্ট ও একটি মাত্র পাঠ্য পুস্তক। নাট্য সংক্রান্ত শিক্ষণীয় যাবতীয় বিষয় ও বস্তুর মধ্যে কোন কোনটি প্রথমে, কোন্ কোনটি মধ্যে ও কোন কোনটি সর্বশেষে শিক্ষণীয় ও অভ্যাসের যোগ্য, ইতি সুচিন্তিত ন্যায়সংগত ও ব্যবহারিক ক্রম ও পদ্ধতির দিঙ্‌নির্ণয় এক মাত্র সংগ্রহ-শাস্ত্রেই আছে। নৃত্ত-সংক্রান্ত শিক্ষণীয় যাবতীয় বিষয় ও বস্তুর মধ্যে,** কোন কোনটি আগে, কোন কোনটি পরে ও ক্রমে ক্রমে শিক্ষণীয় ও অভ্যাসের যোগ্য, ইতি **ব্যবহারিক ক্রম ও পদ্ধতি একমাত্র সংগ্রহ-শাস্ত্রেই বিবৃত হয়েছে, অন্য কোনও নৃত্তশাস্ত্রীয় গ্রন্থ বা রচনার মধ্যে নেই। গান্ধর্ব অর্থাৎ গীত-ও-বাদ্যসংক্রান্ত শিক্ষণীয় যাবতীয় বিষয় বস্তুর মধ্যে** কোন কোনটি আগে ও কোন কোনটি পরে ও ক্রমে শিক্ষণীয় ও অভ্যাসের যোগ্য, **ইতি ব্যবহারিক ক্রম ও পদ্ধতির দ্বারোদ্‌ঘাটন একমাত্র সংগ্রহ-শাস্ত্রেই আছে; অন্য কোনও সঙ্গীতশাস্ত্রে নেই।**

এই মন্তব্য প্রসঙ্গে বার বার "সংগ্রহ-শাস্ত্র" নাম উল্লেখ করলাম; "নাট্যশাস্ত্র" নয়। কারণ, আমরা "নাট্যশাস্ত্র" নামে যে সংস্করণ অনুশীলনীয় মনে করেছি, **সেই নাট্যশাস্ত্রের প্রথমাদি পাঁচ অধ্যায়ের বিন্যাস শিক্ষণ-ক্রম-পদ্ধতির বিপর্যয় সূচিত করে।** শিক্ষার্থী এসেছেন অভিনয় শিক্ষার্থে। অতঃপর, প্রথমেই তাঁকে 'প্রেক্ষাগৃহ-নির্মাণ', "রঙ্গদেবতা পূজন বিধি" ও 'পূর্বরঙ্গ বিধি' শিক্ষা দেওয়া উচিত? কখনই নয়! অথচ, ৬ষ্ঠ অধ্যায় থেকেই সংগ্রহ-শাস্ত্র আরম্ভ হ'ল; এবং এখান থেকে ৩৫শ অধ্যায় পর্যন্ত প্রসঙ্গে ক্রম-পদ্ধতিগত শিক্ষণীয় বিষয়-বস্তুর উপদেশ আছে।

সংগ্রহ-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য বুঝলে, সমগ্র নাট্যশাস্ত্রের রচনা-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য বুঝতে বিলম্ব হয় না।

দেকামেরনের বোক্কাচ্চিয়ো

ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য

উচ্চতি বয়সে যখন সবে গোগ্রাসে বাংলা উপন্যাস গিলতে সুরু করেছি তখন নিতান্ত আকস্মিক-ভাবে বোক্কাচ্চিয়োর নামটি নজরে পড়ে। জনৈক উপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসের এক জায়গায় কায়দা করে অশ্লীল বইয়ের একটি ফিরিস্তি ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। তাতে বোক্কাচ্চিয়োর 'দেকামেরন'-এর নামটিও ছিল। অনুসন্ধানে দেখা গেল কলেজ লাইব্রেরীতে বইটি রয়েছে। কিন্তু প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রকে ও বই ইস্যু করা হবে কেন? তাই একটু বাঁকা পথ ধরতে হয়েছিল। বিশ্রী নিউজ প্রিন্টে খুদে খুদে অক্ষরে ছাপা পাঁচশোর বেশী পৃষ্ঠার বই। ইংরেজীও তার খুব সহজবোধ্য ছিল না। তবুও গভীর আগ্রহের সঙ্গে বইখানি শেষ করেছিলাম এবং তার থেকে বাছাই করে কয়েকটি গল্প বন্ধুদের কাছে ফলাও করে বলেছিলাম। সে কি উল্লাস!

সম্প্রতি প্রথমবারের দীর্ঘ বাইশ বছর পর দেকামেরন দ্বিতীয়বার পাঠ করবার সুযোগ হলো। লণ্ডনের কোন এক বিখ্যাত পুস্তক ব্যবসায়ী বিশ্বের ক্লাসিকস্ সমূহের একটি সিরিজ প্রকাশ করছেন। সেই সিরিজের প্রথম গ্রন্থ হিসাবে দেকামেরনকে স্থান দেওয়া হয়েছে। কেন দেকামেরনকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ সমূহের গোড়ার দিকে স্থান দেওয়া হয় তা এবারকার পাঠের পর বুঝতে পারলাম। ইতালীতে পঞ্চদশ শতাব্দীতে রেণেসাঁর (নব-জাগরণ) সূত্রপাত হয়। হিউম্যানিজম বা মানবিকতাবাদই হচ্ছে নব-জাগরণের প্রথম এবং প্রধান লক্ষণ। রেণেসাঁর ঊষা লগ্নে রেণেসাঁর প্রধান পীঠভূমি ফ্লোরেন্স নগরীতে বোক্কাচ্চিয়ো আবির্ভাব ঘটেছিল। তাঁর গ্রন্থে মানবিকতার প্রথম পদধ্বনি শোনা গেল। চতুর্দশ শতাব্দীতে যখন ঈশ্বর, ধর্ম এবং ধর্মযাজকবৃন্দ নিতান্ত প্রতিভাবানদের দৃষ্টিকেও আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তখন কি এক অবিশ্বাস্য প্রতিভাবলে এই লেখক এত আশ্চর্য মানবাভিমুখিতা দেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। দেকামেরনের একেবারে প্রথম গল্পটিতেই কিভাবে এক জঘন্য চরিত্রের ব্যক্তি ধর্মের কৃপায় মৃত্যুর পর সন্তে (সেইন্ট) পরিণত হতে সক্ষম হয়েছিল তার বর্ণনা দিয়ে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসকে এবং তার ভণ্ডামিকে নগ্নভাবে প্রকটিত করা হয়েছে। মানবজীবনের প্রায় এমন দিক নেই যা দেকামেরনের একশোটি গল্পের কোন না কোনটাতে অনুপস্থিত থেকেছে। বস্তুতঃ কাহিনীর মনোহারিতা, মানবচরিত্রের এমন নিপুণ বর্ণনা, সমসাময়িক সমাজজীবনের এমন নিখুঁত চিত্র, রঙ্গ-ব্যঙ্গ এবং কৌতুকের এমন চমৎকারিত্ব প্রভৃতির একত্র সমাবেশ দেকামেরনকে একটি অবিস্মরণীয় গ্রন্থের আসনে বসিয়ে দিয়েছে।

জিওফ্রে চসার বোক্কাচ্চিয়োর সমসাময়িক সাহিত্যকার ছিলেন। তাঁর ক্যান্টারবেরি টেলসের অসাধারণত্ব সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু তিনি তাঁর কাহিনীর পটভূমিতে ঈশ্বর ও গির্জাকে রেখেছিলেন। ঈশপের গল্প, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, কথাসরিৎসাগর প্রভৃতির মধ্য দিয়ে বিশ্বের ছোটগল্পের জয়যাত্রা আরম্ভ হয় এবং আরব্য রজনীর কহিনীতে এসে নীতিকথামূলক গল্প প্রথম মানবজীবনের কাছাকাছি এসে উপস্থিত হয়। বোক্কাচ্চিয়ো তাকে একেবারে জীবনের কেন্দ্রস্থলে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তার মূলে ছিল বোক্কাচ্চিয়োর জীবনাভিজ্ঞতা।

দেকামেরনের ভূমিকায় বোক্কাচ্চিয়োর বলেছেন—যৌবনের প্রারম্ভ থেকে এখন পর্যন্ত (আজীবন বলা যেতে পারে) এক উত্তুঙ্গ মহান প্রেমে আমি আবিষ্ট আছি যদিও আমার মত

ক্ষুদ্রজনের পক্ষে ঐ প্রেম খুবই গগনস্পর্শী। আমার প্রেম আমার জীবনে গভীর বেদনা এবং বিড়ম্বনার সৃষ্টি করেছে। আমার প্রণয়িনীর নিষ্ঠুরতা (বোক্কাচ্চিয়োর প্রেম ব্যর্থ হয়েছিল) যতটা না এই বেদনার কারণ ঘটিয়েছে তার চেয়ে বেশী ঘটিয়েছে আমার উদ্দাম প্রেম আমার মনে যে আগুন জ্বালিয়েছে তার তীব্র দহন।

এই দহনের যন্ত্রণা থেকে শান্তি পাওয়ার জন্যে বোক্কাচ্চিয়ো দেকামেরন লিখেছিলেন এবং আশা প্রকাশ করেছেন পৃথিবীর অসুখী লোকেরা এর থেকে সান্ত্বনা পাবে।

বোক্কাচ্চিয়োর জীবনের বেদনা কি ছিল?

২

গিয়োভানি বোক্কাচ্চিয়োর জন্মবৃত্তান্ত খানিকটা রহস্যাচ্ছন্ন। তাঁর পিতা ইতালীর ঐ যুগের সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী নগর ফ্লোরেন্সের একজন ব্যাঙ্কার ছিলেন। জনৈকা ফরাসী রমণীর সঙ্গে তাঁর প্রণয়ের ফলে বোক্কাচ্চিয়োর জন্ম হয়। অনেকের মতে তিনি তাঁর পিতার অবৈধ সন্তান ছিলেন। ১৩১৩ খৃষ্টাব্দে (মহাকবি দান্তের মৃত্যুর আট বছর পূর্বে) বোক্কাচ্চিয়োর জন্ম হয়। ফ্লোরেন্সেই বোক্কাচ্চিয়োর বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়। সাত বছর বয়সে লাতিন এবং অঙ্ক-শাস্ত্রের মধ্য দিয়ে বোক্কাচ্চিয়োর অধ্যয়ন সুরু হয়। বোক্কাচ্চিয়োর বাবা ছেলেকে ব্যবসা শেখাতে চান, ছেলে চায় সাহিত্যচর্চা করতে। কিন্তু বাপ অত সহজে ছেলেকে রেহাই দিলেন না। তিনি তাঁকে নেপলসে তাঁর এক কর্মচারীর নিকট বাণিজ্যবিদ্যা শিখবার জন্যে পাঠিয়ে দিলেন। অবশ্য নেপলসে পাঠাবার আরও একটা কারণ ছিল। বোক্কাচ্চিয়োকে তাঁর বিমাতা দেখতে পারতেন না। কাজেই বাবা এক ঢিলে দুই পাখী মারলেন।

পনেরো বছর বয়সে বোক্কাচ্চিয়ো নেপলসে এলেন। নেপলস্ তখন রাজা রবার্টের শাসনে সবিশেষ সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। নেপলসের জীবন বোক্কাচ্চিয়োর কাছে খুবই প্রীতিপদ বলে মনে হলো। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এখানেও দীর্ঘ ছয় বছর ধরে তাঁকে অপ্রীতিকর বাণিজ্যবিদ্যা শিখতে লিপ্ত থাকতে হলো। অবশেষে তাঁর পিতা তাঁকে এই সর্তে রেহাই দিলেন যে, তাঁকে অন্ততঃ আইনজীবী হতে হবে। যাকগে তবুও মন্দের ভাল। আইনের সঙ্গে যথারীতি সাহিত্য-চর্চাও চলতে থাকে। কিন্তু সারাক্ষণ তিনি লেখাপড়াতেই মগ্ন থাকতেন এমন মনে করলে ভুল করা হবে। তিনি বিলাসনগরী নেপলসের পথেঘাটে ঘুরে বেড়াতেন এবং বিচিত্র সব ঘটনার দর্শক হতেন। এই অবস্থায় একদিন এক গির্জায় অসামান্য সুন্দরী এক বিবাহিতা রমণীকে চাক্ষুষ করবার সৌভাগ্য তিনি লাভ করেন। এই মহিলাটি হলেন রাজা রবার্টের কন্যা মারিয়া এক্বুইনো।

মারিয়ার সঙ্গে ক্রমে বোক্কাচ্চিয়োর পরিচয় ঘনীভূত হয় এবং মারিয়া বোক্কাচ্চিয়োর প্রণয়ের প্রতিদান দেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় অতঃপর তিনি বোক্কাচ্চিয়োকে প্রতারিত করেন। বোক্কাচ্চি-য়োর হৃদয় ভেঙ্গে যায়। তদুপরি ঐ সময় তাঁর পিতার ব্যবসা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে তাঁকে নেপলস ছেড়ে ফ্লোরেন্সে চলে যেতে হয়। ঐ সময় তাঁর বয়স মাত্র আটাশ। ইতোমধ্যে মারিয়ার সঙ্গে প্রণয়লীলার পাঁচ বছর পূর্ণ হয়েছে। ফ্লোরেন্সে (টাসকানী প্রদেশ) ফিরে এসে তিনি সাহিত্যচর্চায় একেবারে ডুবে গেলেন এবং একসঙ্গে তিনখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। জিওফ্রে চসারের উপর এদের প্রভাব হলো অপরিসীম এবং এই গ্রন্থ কয়খানির প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায় তিনি ট্রয়লাস ও ক্রেসিদা কাব্য রচনা করলেন। ক্যান্টারবেরী টেলসের অনুপ্রেরণা ও উপাদান তিনি

ওদের থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন।

অতঃপর 'ইউরোপের প্রথম মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস' রচিত হয়। প্রণয়িণী মারিয়াকে বোক্কাচ্চিয়ো এই গ্রন্থে অমর করে রেখেছেন। গ্রন্থখানির নাম 'ফিয়ামেত্তা'। এখানে নায়িকা ফিয়ামেত্তা মারিয়ার স্থান নিয়েছে এবং সে যেন তার প্রেমিক কর্তৃক প্রতারিতা হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনের প্রণয়কাহিনী এখানে বোক্কাচ্চিয়ো উল্টো করে বলেছেন।

বোক্কাচ্চিয়ো কিছুতেই মারিয়াকে ভুলতে পারছেন না। তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত সেই বিশ্বাসঘাতিনী প্রেমিকা পূর্ণ করে রেখেছে— 'A single thought seems to fill his mind: he had loved a princess and been loved in return; she had forsaken him; but she remained the lodestar of his life. He writes really of nothing else but this. Full of her he sets himself to enchant her with stories, to glorify her, to tell over and over again—under how many disguises!—his own story'.

এমন সময় ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে ফ্লোরেন্সে এক মহা বিপর্যয় ঘনিয়ে এলো। ইউরোপের ইতিহাসে এত বড় বিপর্যয় আর কখনো দেখা যায়নি। এই বিপর্যয় হচ্ছে মহামারীরূপে প্লেগের আবির্ভাব। ফ্লোরেন্সের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ লোক এই মহামারীতে মারা গেল। মৃত্যুর এই বিরাট পটভূমিকায় বোক্কাচ্চিয়ো পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'Human Comedy' রচনা করলেন এবং সেই সঙ্গে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে আপনার অক্ষয় আসন চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত করলেন। প্রণয়িণী মারিয়া বেদনার যে তীব্র জ্বালা এই মহান শিল্পীর মনে জ্বালিয়ে দিয়েছিল তাও অতঃপর শীতল হয়ে এলো।

৩

এক মর্মান্তিক বিপর্যয়ের বর্ণনার মধ্য দিয়ে 'দেকামেরন'-এর গল্পগুলির সূত্রপাত করা হয়। এই বিপর্যয় হচ্ছে ফ্লোরেন্সের প্লেগ মহামারী। ১৩৪৮ খৃষ্টাব্দে এই মহামারীর আবির্ভাব হয়। বোক্কাচ্চিয়োর বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে এই মহামারীতে ফ্লোরেন্স নগরীর এক লক্ষেরও অধিক নরনারী কালগ্রাসে পতিত হয়। এই ভয়াবহ মহামারীর এমন নিপুণ ও বাস্তব বর্ণনা বোক্কাচ্চিয়ো দিয়েছেন যা পৃথিবীর যে কোন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের পক্ষেও ঈর্ষার বস্তু। বোক্কাচ্চিয়ো ঐ বর্ণনার এক জায়গায় লিখেছেন—বন্ধু-বান্ধব ক্রমে ক্রমে একে অন্যের খোঁজখবর নেওয়া বন্ধ করতে লাগল। মৃত্যুভয় সকলের মনে এমন গভীর প্রভাব বিস্তার করল যে ভাই ভাইকে, খুড়ো ভাইপোকে, বোন ভাইকে এমন কি স্ত্রী স্বামীকে পরিত্যাগ করল। সবচেয়ে অবিশ্বাস্য ঘটনা হচ্ছে এই যে বাপমা পর্যন্ত তাঁদের রুগ্ন সন্তানদের পরিত্যাগ করলেন। ফলে অগণিত রুগ্ন মানুষের পরিচর্যার আর কেউ রইলোনা। প্রচুর অর্থের বিনিময়েও লোক পাওয়া গেলনা। তখন এক অশ্রুতপূর্ব ব্যাপার ঘটতে লাগল। সম্ভ্রান্ত বংশের সুন্দরী মেয়েরা অসুস্থ হয়ে যে কোন লোককে ডেকে নিয়ে আসতেন এবং তাদের সামনে শরীরের যে কোন অঙ্গ উন্মুক্ত করতে দ্বিধা বোধ করতেন না। ঐ সব মহিলাদের মধ্যে যাঁরা বেঁচে রইলেন পরে যে তাঁদের মধ্যে নৈতিক অবিশুদ্ধতা দেখা দিয়েছিল তার কারণ হচ্ছে এই।

মহামারী থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে সাতটি তরুণী এবং তিনটি তরুণ ফ্লোরেন্স ছেড়ে গ্রামের দিকে যাত্রা করল। ফ্লোরেন্সের বেশ কিছুটা দূরে এসে এক মনোরম বাগানবাড়ীতে তারা আশ্রয় নিল। মহামারীর করাল ছায়া থেকে দূরে এসে তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

অতঃপর সময় কাটাবার জন্যে তারা একটি প্রীতিকর পন্থা আবিষ্কার করল। পন্থাটি হচ্ছে এই যে তাদের মধ্যে প্রত্যেক দিন এক একজন করে রাণী বা রাজা মনোনীত হবে এবং তার নির্দেশে প্রত্যেককেই একটি করে গল্প বলতে হবে। রাণী বা রাজা শেষ গল্পটি বলে সেদিনকার মত গল্প-বলা-খেলার উপসংহার টেনে দেবেন। অর্থাৎ প্রত্যহ দশটি করে গল্প বলা হবে। এইভাবে এই দশটি তরুণ-তরুণী দশ দিন ধরে একশোটি গল্প বলেছেন। তদনুসারেই গ্রন্থের নামকরণ দেকামেরণ (দেকা=দশ, মেরণ=দিন)।

প্রথম দিনের গল্পের জন্য কোন নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু ছিলনা। প্রত্যেককেই নিজের অভিরুচি অনুসারে গল্প বলতে দেওয়া হয়। প্রথম দিনের প্রথম গল্পটি বলে একজন তরুণ। প্রথম গল্পেই ভগবানের পবিত্র নাম নিয়ে যারা ব্যবসা করে তাদেরকে ধরা হয়েছে। প্রথম দিনে যে দশটি গল্প বলা হয় তার চারটিতে একই কথা বলা হয়। অর্থাৎ ধর্ম, গির্জা, মঠ, যাজক এবং যাজিকা প্রভৃতির কথা। এদের স্বরূপ বোক্কাচ্চিয়ো অত্যন্ত নির্মমভাবে উদ্ঘাটন করেছেন। ধর্মের আবরণে এরা যে ভণ্ডামি করত বোক্কাচ্চিয়ো সেই আবরণটিকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছেন। মধ্যযুগে ধর্মীয় কুসংস্কার যখন অত্যন্ত প্রবল তখন এই দুঃসাহস এবং সংস্কারমুক্ত মন কি করে সম্ভব হলো তা ভেবে অবাক হতে হয়। শুধু প্রথম দিনেরই নয় অন্যান্য দিনের গল্পেও সুযোগ পেলেই ধর্মীয় ভণ্ডামিকে উদ্ঘাটন করা হয়েছে। যেমন তৃতীয় দিনের প্রথম গল্পটি এই গল্পটিতে কনভেন্টের সন্ন্যাসিনীদের ন্যক্কারজনক ব্যভিচারের কথা বিবৃত হয়েছে। এক বলিষ্ঠ যুবক কালা ও বোবা সেজে ঐ কনভেন্টে ভৃত্যের কাজ গ্রহণ করে এবং শেষ পর্যন্ত কনভেন্টের সব সন্ন্যাসিনীদের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। এমন কি মঠের প্রধান সন্ন্যাসিনীও বাদ যান নি। অবশেষে যুবকটি প্রধান সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে একদা রাত্রিযাপন কালে কথা বলে ফেলে। সন্ন্যাসিনী তো অবাক। বোবা কথা বলে কি করে? যুবকটি তদুত্তরে জানায় যে এই পবিত্র মঠে বাস করে সে ঈশ্বরের কৃপালাভে সক্ষম হয়েছে এবং তার মুখে বোল ফুটেছে। ব্যভিচারিণী সন্ন্যাসিনী তাই বিশ্বাস করলেন। এর চেয়ে মর্মান্তিক ব্যঙ্গ আর কি হতে পারে?

এই গল্পটির ভূমিকায় বোক্কাচ্চিয়ো বলেছেন—এমন অনেক বোকা আছে যারা মনে করে যে, কোন মেয়ে যখন শরীরে কালো পোষাক ও মাথায় সাদা ঘোমটা দেয় (অর্থাৎ নান্ হয়) তখনই তার স্ত্রীসুলভ সকল ইচ্ছাই লুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু এর চেয়ে ভ্রান্ত ধারণা আর কিছু হতে পারে না। এবং আলস্য ও নির্জনতার মধ্যে দিন কাটায় বলে ওরা আরও বেশী করে জৈব প্রবৃত্তির তাড়নায় আক্রান্ত হয়। মানবপ্রবৃত্তি সম্পর্কে কত স্বচ্ছ ধারণা থাকলে এই উক্তি সম্ভব!

বোক্কাচ্চিয়োর প্রত্যেকটি গল্পেই তাঁর অসাধারণ লোকচরিত্রজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজের সর্বশ্রেণীর নরনারী তার রচনার মধ্যে ভীড় করে ধরা দিয়েছে। বোক্কাচ্চিয়ো তাঁর গল্পগুলির কোন নামকরণ করেন নাই। প্রত্যেকটি গল্পের সূচনায় গল্পের বিষয়বস্তুটি সংক্ষেপে বলে দিয়েছেন। যেমন সপ্তম দিনের গল্পের বিষয়বস্তু স্থির করা হলো—অসতী স্ত্রীরা কিভাবে তাদের স্বামীদের ঠকায় সেই সম্পর্কে কাহিনী। এই সম্পর্কে দশজনে দশটি কাহিনী বলবে। প্রত্যেকটি কাহিনীর গোড়ায় ছোট্ট করে গল্পটির মূল বিষয় বলে দেওয়া হয়েছে। যেমন—এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহ করে। স্ত্রীটি পায়ে একটি সুতো বেঁধে বিছানায় শোয়, প্রেমিক এসে তার দ্বারা সংকেত করে। স্বামী তা ধরে ফেলে এবং একদিন প্রেমিককে তাড়া করে। স্ত্রীলোকটি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে যায় এবং ঝিকে বিছানায় এনে শুইয়ে রাখে। স্বামী ফিরে এসে ঝিকে প্রহার করে এবং শ্বশুরবাড়ীর লোকজনদের ডেকে আনে কিন্তু পরিণামে বোকা বনে।

বোক্কাচ্চিয়োর গল্পগুলির মধ্যে কৌতুক, ব্যঙ্গবিদ্রূপ এবং ইন্দ্রিয় লালসার কথাই সর্বাধিক স্থান পেয়েছে। কিন্তু এটাই বোক্কাচ্চিয়োর সম্যক পরিচয় নয়। খাঁটি প্রেম, বীর্যবত্তা, আত্মত্যাগ প্রভৃতি মানবহৃদয়ের মহৎ গুণাবলীও অপূর্ব সহানুভূতির সঙ্গে তাঁর কাহিনীগুলিতে চিত্রিত হয়েছে। তাঁর অনেকগুলি গল্পেই এমন সার্থক উপাদান রয়েছে যা একটু অদলবদল করলেই এ যুগের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসে রূপান্তরিত হতে পারে। বোক্কাচ্চিয়ো শুষ্ক নীতিবাগীশতার জয়গান করেননি। মানবিক বৃত্তিসম্পন্ন সুস্থ ও বুদ্ধিমান মানুষেরা কিভাবে জীবনকে উপভোগ করে বোক্কাচ্চিয়ো একদিকে যেমন তাদের কাহিনী শুনিয়েছেন অন্যদিকে ধূর্ত, ইতর, ধর্মব্যবসায়ী প্রভৃতির স্বরূপও কতকগুলি কাহিনীতে উদ্ঘাটিত করেছেন। নির্বোধ মানুষদের জন্য বোক্কাচ্চিয়োর লেখনী থেকে একবিন্দু সহানুভূতি উৎসারিত হয়নি। বোকা এবং মূর্খেরা তো প্রতারিত হবেই। তাদের জন্যে সহানুভূতি দেখিয়ে লাভ কি? বারেবারেই তারা বুদ্ধিমানের শিকার হবে। চতুরা এবং রসবতী রমণী তার বোকা স্বামীকে আরও বোকা বানিয়ে জীবনকে উপভোগ করবে বৈকি! কিন্তু এর নীতিজ্ঞানহীনতা আমাদের মনকে পীড়া দেয়। কিন্তু বোক্কাচ্চিয়ো তাঁর গল্পে নীতি কথা শোনাননি।

৪

ইতালীয় সাহিত্যে দান্তে (১২৬৫-১৩২১ খৃস্টাব্দ) এবং পেত্রার্ক (১৩০৪-৭৪ খৃস্টাব্দ) স্ব স্ব মহিমায় ভাস্বর। কিন্তু তাঁদের অসাধারণ বৈদগ্ধ্য তাঁদের জনসমাজ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। বোক্কাচ্চিয়ো প্রথম জনগণের সাহিত্য রচনা করলেন। তৎকালীন ইতালী এবং সেই দেশের বৃহত্তর জনসমাজ যেন দেকামেরনে জীবন্ত হয়ে দেখা দিয়েছে। সুনীতি এবং দুর্নীতি সহ সামগ্রিক জীবনকে তিনি তাঁর অমর গ্রন্থে রূপায়িত করেছেন। তাঁর গ্রন্থের অমরত্বের প্রধান কারণ হচ্ছে— The book is full of people, living people—that is the secret of its immortality.

আরব্য রজনীর এবং চসারের ক্যাণ্টারবেরি টেলস যে ভঙ্গীতে রচিত দেকামেরনের ভঙ্গীও তাই। কিন্তু দেকামেরণের গল্পগুলোর আকর্ষণ অসাধারণ। যে দশজন পাত্রপাত্রী এই গল্পগুলো বলেছে তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ গল্পের সূত্রতে কিছু কিছু ভণিতা যোগ করেছে। সেই ভণিতা ততটা চিত্তাকর্ষক নয়। 'It is the stories that matter. In Chaucer's Canterbury tales the tales often weary us but the tellers never do: in Boccaccio the tales never weary us but the tellers always do. The Decameron is a world in itself and its effect upon us who read it is the effect of life which includes, for its own good, things moral and immoral. The book has the variety of world and is full of an infinity of people who represent for us the 14th century in Italy in all its fullness. It deals with man as life does, never taking him very seriously or without a certain indifference, a certain irony and laughter. Yet it is full too of a love of courtsey, of luck, of all sorts of adventures both gallant and sad'. (Encyclopaedia Britanica).

বোক্কাচ্চিয়োর বিরুদ্ধে যে অভিযোগটি সর্বাপেক্ষা সরব তা হচ্ছে তার গল্পের অশ্লীলতা। কথাটি একেবারেই সত্য নয়। প্রথমতঃ বোক্কাচ্চিয়ো অশ্লীল ঘটনার বিস্তৃত বিন্যাস কোথায়ও করেননি, শুধুমাত্র ইঙ্গিতে বক্তব্য সেরেছেন। দ্বিতীয়তঃ বোক্কাচ্চিয়ো জনগণের মধ্যে বহুল

প্রচলিত এই গল্পগুলো সংগ্রহ করে তাদের সাহিত্যিক সৌন্দর্যে মণ্ডিত করেছেন। 'ভাল্‌গার' জনগণের গল্পে যথেষ্ট ভাল্‌গারিটি ছিল। আমাদের জনসমাজের মধ্যেও ঐরূপ আদিরসাত্মক গল্পের অসদ্ভাব নেই। বোক্কাচিয়ো এই ভাল্‌গারিটিকে সাহিত্যে শিল্পসম্মত উপায়ে স্থান দিয়েছেন। অবশ্য কারো কারো রুচিতে তা বাধতে পারে। যেমন বেধেছিল বোক্কাচ্চিয়োর পরম সুহৃদ পেত্রার্কের। তিনি বলেছিলেন, 'It is written for the vulgar'.

বোক্কাচ্চিয়ো বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তার গল্পগুলিকে দশটি সুনির্দিষ্ট ভাগে বিভক্ত করে নিয়েছিলেন এবং দশ দিনে পূর্বে উল্লিখিত দশজন তরুণতরুণী রাণী বা রাজা মনোনীত হয়ে পূর্বেই গল্পের বিষয়বস্তু নির্বাচন করে দিয়েছে। ফলে গল্পগুলি এলোমেলো না হয়ে এক নির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হয়েছে। দেকামেরনের গল্পগুলির প্রধান ত্রুটি এই যে ঐগুলি বিবৃতি-মূলক। এজন্যে অনেক সময় গল্পে বর্ণিত চরিত্রগুলি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠেনি। কাহিনী বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে পাত্রপাত্রীদের মুখে তিনি যদি সংলাপ প্রয়োগ করতেন তবে দেকামেরন নিঃসন্দেহে আরও সরস হয়ে উঠত।

বোক্কাচ্চিয়ো বহু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তবে দেকামেরনই তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। বোক্কাচ্চিয়োর পাণ্ডিত্যখ্যাতিও কম ছিলনা। দান্তের 'ডিভাইন কমেডি'র তিনি তখনকার দিনের সবচেয়ে বড় সমজদার ছিলেন। দুঃখের বিষয় এই যে, এই অমর কথাশিল্পীর শেষ জীবন অত্যন্ত কষ্টে কাটে। নিদারুণ অর্থকৃচ্ছ্রতার হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য তাঁর বন্ধুবান্ধবরা তাঁকে দান্তে সম্পর্কে বক্তৃতা দেওয়ার কাজ জুটিয়ে দিলেন। বোক্কাচ্চিয়ো তখন কঠোর পরিশ্রমের সঙ্গে সাহিত্য সমালোচনার কাজে নিযুক্ত হলেন। সৃজনশীল সাহিত্যিক তাঁর প্রতিভাকে শুষ্ক বৈদগ্ধ্যের গণ্ডীতে আবদ্ধ করতে বাধ্য হলেন। ১৩৭৫ খৃস্টাব্দে ৬২ বছর বয়সে বোক্কাচ্চিয়োর মৃত্যু হয়। ১৮২৭ খৃস্টাব্দে ফ্লোরেন্স নগরী থেকে ১৭ খণ্ডে প্রথম বোক্কাচ্চিয়োর রচনাবলী প্রকাশিত হয়। তাঁর দেকামেরন ইউরোপের প্রত্যেকটি ভাষার সাহিত্যকে কোন না কোন দিক দিয়ে প্রভাবিত করেছে।

কবিতার ওজন ও কৌতুকরস

অজিতকৃষ্ণ বসু

অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইংরেজ হাল্‌কা কবি ("পাঞ্চ" নামক বিশ্ববিখ্যাত কৌতুকপ্রধান সাপ্তাহিক পত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গদ্য-পদ্য-লেখক) শ্রী এ. পি. হার্‌বার্ট তাঁর একটি নিবন্ধে লিখেছেন :

"The writers of *light* verse have a good title to lecture the *serious* poets at the present time. It has never been clear to us why light verse, however good, should be regarded as inferior to *serious* poetry, however bad. Slim volumes of *careless undergraduate gush*, formless and, to most minds, meaningless, have always received much more attention from the literary papers than the works of *master of the lighter art,* which are generally described as '*these gay pages*' or '*joyous doggerel*'. The technique (if any) of the *serious* lads is analyzed with serious solemnity, but the technique of Mr. Belloc or Mr. Chesterton or Mr. J. C. Squire (in their lighter moods), or Sir Owen Seaman, Mr. A. A. Milne, Mr. E. V. Knox, or Mr. Harry Graham, has never, so far as I know, been mentioned in public, though it is the fruit of immense ability and labour...... This is one illustration of the first main theme of my lecture: *The undervaluation of light or comic poetry.* It is not sufficiently esteemed as a difficult and important form of literary art......" ("Brief lecture to a serious poet"—A. P. Herbert)

নিবন্ধটি ত্রিশ বছর আগে ছাপা হয়েছিল, সুতরাং অনুমান করা যায় লেখা হয়েছিল তারও আগে। কিন্তু এতে হারবার্ট যে কথা বলেছেন, তার সত্যতা আজও ম্লান হয় নি। তথাকথিত 'সিরিয়াস' বা ওজনদার কবিতা নিতান্ত অর্বাচীন মার্কা বাজে হলেও তাকে উঁচুদরের 'হাল্‌কা' কবিতার চাইতে অনেক বেশী সমীহ করা এবং অনেক বেশী মর্যাদা দেওয়া হয়ে থাকে। এই 'ওজনদার' কবিদের 'টেকনিক' বা আঙ্গিক নিয়ে গভীর-গম্ভীর বিশ্লেষণী আলোচনা হয়ে থাকে, কিন্তু তথাকথিত 'হাল্‌কা' কবিদের আঙ্গিক বা রচনাশৈলী নিয়ে সে ধরণের আলোচনা হতে দেখা যায় না, যদিও রসোত্তীর্ণ 'হাল্‌কা' কবিতা প্রচুর প্রতিভা এবং পরিশ্রম সাপেক্ষ। হাল্‌কা কবিতা এবং হাসির কবিতা ও যে কাব্যসাহিত্যের মূল্যবান অংশ, এবং এ ধরণের কবিতা লেখা 'ওজনদার' কবিতা লেখার চাইতে বেশী শক্ত এবং প্রতিভাসাপেক্ষ, সাহিত্য জগতে এখনো সে সত্য যথেষ্টভাবে অনুভূত হয় নি। হারবার্ট বলছেন কবি গ্রে একটি 'এলিজি' বা শোককবিতা লিখেই বিখ্যাত হয়েছিলেন (এখনও আছেন), কিন্তু বিখ্যাত হবার জন্যে গিলবার্ট-কে এক ডজন 'অপেরা' বা কাব্য-গীতি-নাট্য লিখতে হয়েছিল, এবং অত লিখেও 'এলিজি'-খ্যাত কবি গ্রে-র মত গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা তিনি পান নি। কেন পান নি? কারণ গ্রে 'ওজনদার' কবি, এবং গিলবার্ট 'হাল্‌কা' কবি। গ্রে-র কবিতায় গুরুগম্ভীর আবহাওয়া, ভারী ওজনের তত্ত্ব; আর গিলবার্টের কবিতায়, গানে হাল্‌কা হাসি আর কৌতুক রসের উচ্ছলতা, তারা মনের ওপর ওজন চাপায় না, মনকে কৌতুকের বেলুনে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। গিলবার্টের রচনাতেও গভীর জীবন-দর্শন আছে, কিন্তু তা পরিবেশিত হয়েছে হাল্‌কা হাসির মাধ্যমে, হাল্‌কা ছন্দে, হাল্‌কা শব্দ-

বিন্যাসে, কৌতুকের বিভিন্ন বিচিত্র ভঙ্গীতে। সেই কারণেই (অপরাধেই?) গ্রে-র চাইতে কম প্রতিভার অধিকারী না হয়েও গিলবার্ট সাহিত্যক্ষেত্রে অনেক কম খ্যাতি এবং কম মর্যাদা প্রাপ্ত হয়েছেন। সাহিত্যপণ্ডিত এবং সাহিত্যরসিকদের মনে কবিতা সম্পর্কে একটা ওজন-কম্‌প্লেক্স কাজ করছে; তাঁরা ভাবছেন কবিতায় ওজন চাই, ওজন না থাকলে উঁচুদরের কবিতা হবে কি করে? ওজোন (OZONE) না থাক, ওজন চাই। কবিতা ওজনে হাল্‌কা হলে সাহিত্যপণ্ডিতরা তাকে সহজে আমল দিতে নারাজ; হাল্‌কা কবিতা কল্‌কে পায় না তাঁদের কাছে।

উদ্ধৃত করা যাক কোনো আন্‌কোরা নতুন 'সিরিয়াস' কবিতা :

"কঙ্গো নদীর তীর থেকে বঙ্গোপসাগরের তীর পর্যন্ত
বিস্তৃত আমার স্বপ্ন;
আল্‌প্‌স্‌-এর অল্প অরণ্য স্বল্প ছায়া ফেলে আমার আরাবল্লীতে;
ঊষর গোবি-র ধূসর ছবি প্রতিবিম্বিত আমার অনন্ত আকাশে,
যেখানে উড়ে উড়ে ধানসিঁড়ি খেতের সীমানা খোঁজে শঙ্খচিল।
বিবর্ণ মৌমাছির মধু খোঁজা ব্যর্থ হয়ে গেছে,
বোবা কান্না জমেছে মৌচাকের বুকে,
পথে পথে জমেছে পথিকের পায়ের স্বাক্ষর,
তবু—তবু—তবু এক মন্ত্র জপি,
ঊর্ধ্বশ্বাসে, রুদ্ধশ্বাসে মন্ত্র জপি
হ্যামলেট-বিহীন 'হ্যামলেট' নাটকের মতো।..."

অথবা :

"মিছে কথা। তোমাকে কি প্রশ্ন করি? প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন নয়।
সে শুধু প্রশ্নের ছলে নিজেরি হৃদয়
থেকে আবরণ হঠাৎ কেড়ে নিয়ে
তোমার আলোর সাম্‌নে তুলে ধরা।
জান্‌তে আমি পারি নি তো কেন তোমার কোথায় ব্যথা বাজে,
তবু ত্রিশংকুর শংকা আর অশ্বত্থামার ভ্রান্তির মতো
হয় তো তোমারো দিগন্তের দিশারী পান্থ
এসে বল্‌বে আর্কিমিডিসের মতো;
ইউরেকা! ইউরেকা! ইউরেকা!!

অথবা :

"গন্ধরাজের পাপ্‌ড়ির মতো চোখে
ভীরু ম্যাড়্‌মেড়ে দৃষ্টিতে, আর
দেশালাইর শেষ কাঠির শেষ স্ফুলিঙ্গের মতো হাসি
দেখ্‌লাম, আবার দেখ্‌লাম তোমার।
সাম্রাজ্য ফুঁকে দিয়ে ফাঁকা আর্জি পেশ করার
মতো মর্জি যদি বা থাকে
তবু ভোজবাজির বাজিহীন ভোজে কোন লজ্জায়
ডাক্‌বো তোমাকে"

এবারে 'হাল্‌কা' (অ-সিরিয়াস) পদ্য-রচনার একটি উদাহরণ নেওয়া যাক ঃ

"নাঁচুটোন আছে, ঘুড়ি তাই ওড়ে উচ্চে,
খাড়া বয় কিছু ভার আছে বলে পুচ্ছে।
নাগাল না পেয়ে শিবা আঙুরের গুচ্ছে
রেগে বলে 'এর চেয়ে ঢের ভালো উচ্ছে।'..."

প্রথমোদ্ধৃত তিনটি 'সিরিয়াস' কবিতার ওজন আছে, কারণ তাদের প্রত্যেকেই গুরুগম্ভীর, গালভরা শব্দের এবং দুর্বোধ্যতার অথবা অবোধ্যতার ভারে ভারাক্রান্ত। প্রত্যেকটির ক্ষেত্রেই কবির কোনো বক্তব্য নেই, তিনি অর্থহীন আবোলতাবোল কথার পর কথা এমনভাবে সাজিয়ে গেছেন যে সাহিত্য-জগতের একাধিক গন্ধনিপুণ, সমঝদার এবং ইজম-কমপ্লেক্সযুক্ত নাক এদের ভেতর অনায়াসে মিস্টিসিজম, সিমবলিজম, ইমেজিজম, প্রভৃতি একাধিক ইজম-এর গন্ধ পাবেন। যাঁরা পাবেন না, যাঁদের কাছে এই গভীর, গম্ভীর, মিস্টিক চেহারার কবিতাগুলো আসলে অর্থহীন প্রলাপ বা ধাপ্পা বলে মনে হবে, তাঁদের ভেতরও অনেকে বোল্ধা সমাজে অপাংক্তেয় গণ্য হবার ভয়ে এদের খাঁটি 'সিরিয়াস' কবিতা বলে মেনে নেবার ভান করবেন।

কিন্তু আমার বিশ্বাস এই প্রথমোদ্ধৃত তিনটি 'সিরিয়াস' কবিতার সমবেত মূল্যের (যদি এদের কিছু মূল্য থাকে) চাইতে শেষোক্ত চার লাইনের হাল্‌কা কবিতাটির মূল্য অনেক বেশি। কবিতাটিতে মিল আছে, মজা আছে, দুর্বোধ্যতা নেই, কবি ধাপ্পাবাজি বা পাণ্ডিত্য ফলান নি। আমার এও মনে হয় উক্ত ধরণের তিনটি 'সিরিয়াস' কবিতা লেখার চাইতে শেষোক্ত চতুষ্পদীটির মতো একটি হাল্‌কা কবিতা লেখা বেশি কৃতিত্বের পরিচায়ক, এবং কবিতা-সাহিত্যের পক্ষে বেশি লাভজনক।

আজকাল 'সিরিয়াস' কবিতা লেখায় ঝামেলা অনেক কম; 'সিরিয়াস' কবিদের স্বাধীনতা প্রায় অগাধ। মিল না থাকলে কোনো ক্ষতি নেই, ছন্দ থাকাটাও বাধ্যতামূলক বা অত্যাবশ্যক নয়, গদ্য পদ্যের ব্যবধান ও আজকাল অতি সূক্ষ্ম রেখায় এসে দাঁড়িয়েছে। ফলে প্রায় যে কোনো গদ্য রচনার যে কোনো অনুচ্ছেদের পংক্তিগুলো বিভিন্ন আকারে টুকরো টুকরো করে কেটে নিয়ে পর পর ছোট বড় লাইনে সাজিয়ে অনায়াসে গদ্য কবিতা বলে চালানো চলে। ফলে অতি সাধারণ তুচ্ছ প্যারাগ্রাফকে অল্পায়াসেই 'সিরিয়াস' কবিতায় রূপান্তরিত করা যায়। গদ্য লেখকদের তুলনায় কবিদের এইটেই বিশেষ সুবিধা। উদাহরণরূপে ধরা যাক একটি সাধারণ ঘটনার সাদামাটা গদ্য বিবরণী ঃ

"শিয়ালদা মেন স্টেশন থেকে ন'টা বেজে পাঁচ মিনিটে বনগাঁ লোক্যাল ছাড়ে। গাড়ী ছাড়বার দশ মিনিট আগে এসে টিকেট কিনে একটা থার্ড ক্লাস কামরায় উঠে বসলাম। বেশ ভিড় আর বেশ গরম। ঘেমে উঠলাম। পাঞ্জাবীর তলায় গেঞ্জি ভিজে গেল। প্ল্যাট ফর্মের ওপরে লাউড স্পীকারে অস্পষ্ট মেয়েলী কণ্ঠে শোনা গেল পালাক্রমে তিনটি ভাষায়—ইংরেজি, বাংলা ও হিন্দী—বনগাঁ লোক্যাল ছ' নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ন'টা বেজে পাঁচ মিনিটে ছাড়বে।....ছাড়ল। প্ল্যাটফর্মের বাইরে চলতি ট্রেনের কামরায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।"

সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিশেষ খাতির বা বিশিষ্ট সম্পর্ক না থাকলে উক্ত গদ্য প্যারাগ্রাফটি কোনো সাময়িক পত্রে সাহিত্য রচনার নমুনা রূপে ছাপানো সম্ভব হবে না। ওতে এমন কিছু খবরও নেই যে সংবাদ বলে ছাপা যাবে। একে সাহিত্য রূপ দেবার সহজ উপায় হচ্ছে কবিতা। কোনো 'সিরিয়াস' কবি এই প্যারাগ্রাফটিকে এভাবে কবিতা-রূপ দিতে পারেন ঃ

বনগাঁ লোক্যাল

ন-টা বাজতে পাঁচ। এলাম শিয়ালদা। যাবো বনগাঁ।
(স্টেশনের ঘড়ির চাকা ঘুরছে অলাত-চক্রের মতো)।
টিকিট করলাম লাইনে দাঁড়িয়ে। (হায় লাইন!
তুমি সিনেমায়, তুমি রেশনে, তুমি স্টেশনেও!!)
ওদিকে ছ-নম্বর প্ল্যাটফর্মের ধারে
লাইনে দাঁড়িয়ে বনগাঁ লোক্যাল।
ছুটলাম!..!!..!!!
উঠলাম থার্ড ক্লাস কামরার গরম ভিড়ে।
ঘামে ভিজে গেল পাঞ্জাবীর তলায়
ব্যাকুল গেঞ্জী!! (হায় গেঞ্জী!!!)
প্ল্যাটফর্মের ওপরে তরঙ্গিত টিনের ছাত,
তারি তলায় হিন্দী, বাংলা, ইংরিজি
তিন ভাষায় জানানী দিচ্ছে মেয়েলী কণ্ঠ ঃ
ন'টা পাঁচ ছেড়ে যাবে বনগাঁ লোক্যাল।
অনাবশ্যক, আর তোমার চেঁচানো অনাবশ্যক হে সুন্দরী!
ন'টা পাঁচেই ছাড়ুক আর সাতেই ছাড়ুক,
একবার চেপে যখন বসেছি তখর আর ফসকাচ্ছি নে।
বাজলো ন'টা পাঁচ, বাজলো প্যান্টালুন পরা শ্যামের বাঁশী,
উড়লো তরুণ রঙা নিশান।
নিশানের ইসারায় ইঞ্জিনে বেজে উঠলো বাঁশী।
(সে তো বাঁশী নয়, বুক ফাটা আর্তনাদ যেন
'বিদায় শিয়ালদা' বলছে কেঁদে কেঁদে।)
গাড়ী ছাড়ল। গায়ে লাগল চলার হাওয়া।
পিছে পড়ে রইল শিয়ালদা স্টেশন।
(হায় শিয়ালদা, ব্যাকুল শিয়ালদা!
বুঝি তোমার বিচ্ছেদের ব্যথা,
তবু এও বুঝি, এও জানাই তোমাকে ঃ
আবার তোমার বুকে ফিরে আসবে বনগাঁ লোক্যাল।)

বনগাঁ-লোক্যাল সম্পর্কিত গদ্য প্যারাগ্রাফের এই কবিতা-রূপটি পাঠালে এটি সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশার্থে মনোনীত হতেও পারে, কারণ গদ্যে যা ছিল, নিরপেক্ষ, 'অবজেক্‌টিভ্' বিবরণ মাত্র, কবিতা-রূপে তাই কবির অনুভূতি ও বাক্তিত্বের রঙে রঙীন, তাঁর 'আপন মনের মাধুরী মিশানো 'সাবজেক্‌টিভ্' চিত্রকল্পে পরিণত হয়েছে।

ওপরের নমুনাটি আধুনিক 'সিরিয়াস' কবিতার যথার্থ রূপ পেয়েছে কিনা সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ নই। বিশেষ করে বনগাঁ লোক্যাল সংবাদের উক্ত কবিতা-রূপে কীর্তন গানে আখরের মতো ব্র্যাকেটে যে ফাল্‌তু বচন বসিয়েছি, সেগুলো হয় তো ঠিক 'সিরিয়াস' কবিতার বর্তমানে চালু আঙ্গিক-সম্মত নয় বলে আমার মৃদু সন্দেহ হচ্ছে। যাই হোক, নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো, সুতরাং এই উদাহরণ দিয়েই আশা করছি বর্তমান আলোচনায় কাজ

চলে যাবে।

এ. পি. হারবার্টের মত এবং মন্তব্য মেনে নিলে বলা যায় যে উক্ত ধরণের কবিতা কোনো 'সিরিয়াস' কবির কলম থেকে বেরোলে তা বরদাস্ত—এমন কি হয় তো আদৃত ও—হবে, কারণ ভাষা, মিল, ছন্দ, আঙ্গিক ইত্যাদির ব্যাপারে 'সিরিয়াস' কবিদের নিরঙ্কুশ হবার লাইসেন্স আছে, তাঁদের সাতাধিক খুন মাফ। কিন্তু 'হাল্‌কা' কবিদের অমন লাইসেন্স নেই। পাঠক, সমালোচক, পণ্ডিত সবাই এঁদের কাছে অনেক বেশি দাবী করেন। হাল্‌কা কবিতা দুর্বোধ্য, অবোধ্য, বিরক্তিকর হলে চল্‌বে না; কল্পনা বা আঙ্গিকের দৈন্য বা দুর্বলতা মিস্টিসিজ্‌ম্‌, সিম্বলিজ্‌ম বা অন্য কোনো ইজ্‌ম্‌-এর দোহাই (অর্থাৎ ভাঁওতা) দিয়ে ঢাকা চল্‌বে না। হাল্‌কা কবিতা সুললিত হওয়া চাই, এবং শুধু সুবোধ্য হলে চলবে না, উপভোগ্য হওয়া চাই। সোজা কথায়, হাল্‌কা কবিতা কৌতুক রসে মধুর হওয়া চাই। মুস্কিল এই খানেই, কারণ কৌতুক রসের আমদানী করা, কৌতুক রস মনোরমভাবে পরিবেশন করা সহজ নয়। আমরা রোজকার জীবনে যা ঘটতে দেখ্‌ছি তার প্রায় নিখুঁত 'সিরিয়াস' রিপোর্টিং করবার মতো রিপোর্টার অনেক পাওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু ঘরের ও বাইরের দৈনন্দিন ঘটনা (ও রটনা) থেকে কৌতুকের রসদ সংগ্রহ করে সে কৌতুকের সরস পরিবেশন করবার মত প্রতিভা তেমন সুলভ নয়। এবং সেই কৌতুককে কবিতার আঙ্গিকে রূপায়িত করার প্রতিভা আরো দুর্লভ।

'সিরিয়াস' অর্থাৎ 'ওজনদার' কবিতা দৃষ্টিকটু, শ্রুতিকটু, মিলহীন, ছন্দহীন, অর্থহীন, এমন কি কাণ্ডজ্ঞানহীন হলেও চলে, এবং বর্তমান দুনিয়ায় অধিকাংশ (তথাকথিত) 'সিরিয়াস' কবিতাতেই এই গুণগুলো কম বেশী বর্তমান বলে কেউ কেউ বলে থাকেন। 'সিরিয়াস' কবিতার ক্ষেত্রে অর্থহীনতা, নীরসতা এবং দুর্বোধ্যতা নিজেকে গভীরতা বলে চালাতে পারে, আঙ্গিকের বহুবিধ দুর্বলতা পার পেয়ে যেতে পারে নতুন 'এক্সপেরিমেণ্ট' বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা বলে। কিন্তু —ঐ যে আগেই আভাসে বলেছি—হাল্‌কা কবিতার বেলায় এ ধরণের সুবিধা একেবারে নেই বললেই চলে। হাল্‌কা কবির পান থেকে চুন খসা সহজে ক্ষমিত হবে না।

এ. পি. হারবার্ট 'সিরিয়াস' কবিদের লক্ষ্য করে বলছেন : "মহাশয়গণ! যতক্ষণ আপনারা আপনাদের 'সিরিয়াস' কবিতার এলাকায় বিচরণ করবেন ততক্ষণ আপনাদের সব রকম উৎকেন্দ্রিকতা, সব রকম শৃঙ্খলা-ভাঙা ছন্নছাড়ামি হয়তো সহজেই পার পেয়ে যাবে। আপনাদের নতুন ভাবধারা পুরাতন ভাষায়, পুরাতন আঙ্গিকে প্রকাশ করা অসম্ভব, তাই আপনারা হাতড়ে বেড়াচ্ছেন নতুন ভাষা, নতুন আঙ্গিকের সন্ধানে। আপনাদের নয়া কবিত্বের উন্মত্ত দুর্বার জলতরঙ্গ পুরাতন আঙ্গিকের বাঁধ ভেঙে বিপুল শক্তিতে এগিয়ে চলেছে, এই উদ্দাম বন্যার মুখে ভেঙ্গে চুড়মার হয়ে যাচ্ছে পুরাতন ছন্দ মিল পদ্ধতি, প্রচণ্ড ভাবাবেগে 'প্যারট'-এর সঙ্গে 'স্পিরিট'-এর মিল না দিলে আপনাদের চলছে না। তুচ্ছ মিল নিয়ে সেকেলে ভঙ্গীতে খুঁত খুঁত করে দ্রুত ধারমান কবিতার পায়ে নিগড় পরানোর মতো ছেলেমানুষি মূর্খতা আপনাদের জন্যে নয়। জানি বন্ধু, যে মুহূর্তে আপনাদের ঐ 'সিরিয়াস' কবিতার এলাকা ছাড়িয়ে হাল্‌কা কবিতার এলাকায় পা বাড়াবেন সে মুহূর্তে জানবেন আপনাদের ঐ এলাকার খামখেয়ালী এ এলাকায় চল্‌বে না।"

হারবার্টের নিজের ভাষাই উদ্ধৃত করি :

"So long as you confine yourself to serious poetry you may (as they vulgarly say) get away with it. But if you are going to be funny, or even light, it will not do. It is the old story. *The parson may provoke us to yawns with im-*

punity, but the comedian must hold his audience all the time. This is a very hard school of writing. If we set out light-heartedly on a difficult rhyming scheme we must go on with it, and no explosive inspiration, revolts of youth, and what not, will excuse us if we fail. But you serious lads come blustering in and think you can do what you like. You bespatter your pages with dreadful slovenly rhymes, and when we complain, you say you did it for fun!"

এখানে একটা কথা বলে রাখা অত্যাবশ্যক বলে মনে করি। 'সিরিয়াস' কবিতার ক্ষেত্রে বড় আপদ যেমন অর্থহীন দুর্বোধ্যতা, হাল্‌কা কবিতার পক্ষেও তেম্নি যাকে বলে সস্তা ভাঁড়ামি তারই পর্যায়ে নেমে যাওয়া অসম্ভব নয়, এবং এ কথা স্মরণে রেখে 'হাল্‌কা' কবিদের এবং 'হাল্‌কা' কবিতার রসগ্রাহী পাঠক পাঠিকার ও হুঁশিয়ার থাকা উচিত। 'হাল্‌কা' মানেই খেলো নয়, এবং নীচু ফাজ্‌লামি বা কাতুকুতু প্রসূত হাসি হাসারসের অন্তর্গত নয়। সত্যিকারের সুরুচিসম্মত রসোত্তীর্ণ হাল্‌কা হাসির কবিতা লেখা সহজ নয়। একটি চরম উদাহরণ নিয়ে বলি, আবোল-তাব্বোল লিখলেই তা "আবোল- তাবোল" হয় না। এ কাজ যত সহজ মনে হয় তত কঠিন। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে কবিগুরুর :

"সহজ কথা লিখ্‌তে আমায় কহ যে,
সহজ কথা যায় না লেখা সহজে।"

কবিতার 'ওজন' সম্পর্কে একজন খেয়ালী কবির মন্তব্য উদ্ধৃত করা বাঞ্ছনীয় মনে করছি :

"Save me from *serious* poems, poems of *weight,*
Penned by people that have no poems to write,
Yet write poems but to count themselves poets;
Poems that mean little, pretending to mean a lot,
Passing the haze of unmeaning as the halo of philosophy.

Save me from the deadweight of such ponderous poetry;
Give me the light of light poems shunning wise pretensions,
And stretching the lungs with laughter or the lips with a smile.
With no love for the shallowness of seeming depths,
I would hate any squeezing of the Poetic Muse
Into tortuous twists of philosophic pretence,
For me a laughter or a smile is philosophy enough".

ওজন দেবীর ঐ যে পূজা-বেদী, চিরকাল কি রইবে খাড়া? ওজনের চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করতেই হবে, তা সে মুক্তই হোক আর জীবন্তই হোক, জড়ই হোক আর চেতনই হোক? এই ওজন কম্‌প্লেক্স থেকে মুক্তি পাওয়া আমাদের মানসিক এবং সাহিত্যিক স্বাস্থ্যের পক্ষে নিতান্তই প্রয়োজন।

উক্ত খেয়ালী কবির অপর একটি উক্তির অংশ সর্বশেষে উদ্ধৃত করি :

"Oh, great are Tagore, Shakespeare, Keats, Browning, and even
Sarojini Naidu;

Nobody adores them and their poetry more ardently than I do.
We are blinded by the splendour of their dazzling zone;
They are not *with* us or *among* us, but are high up in a mightly world
of their own,
While, on the other hand, the light nonsense-rhymers,
Be they modern, or be they old-timers,
Are *with* us and *among* us, we rub shoulders and shake hands with them
And beside the river of life we dance upon the sands with them.
Oh, the world is too full of weepers in these tumultuous, troubled times;
So to lighten our hearts with light laughter, O Lord, send us more
writers of nonsense-rhymes".

আমাদের জীবন নানাদিক দিয়ে নানাভাবে ভারাক্রান্ত। অতএব আমাদের ওপর আরো ওজনদার কবিতার ভার না চাপিয়ে বরং আরো আরো কৌতুক-রসিক হাল্‌কা-কবি পাঠাও, হে ভগবান!

ইউজেন বিউরণুফ্

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

ইউজেন বিউরণুফ ১৮০১ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল ফ্রান্সের প্যারী নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইউজেনের পিতা জাঁ লুই বিউরণুফ সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন. তাঁহার রচিত গ্রীক্ ভাষার ব্যাকরণ তৎকালে ফ্রান্সে, সুপরিচিত ছিল। শিশুকাল হইতেই বিউরণুফ মেধাবী ছাত্র হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। লুই-লু গ্রা ও একোল দ্য শার্ত বিদ্যালয়ে অধ্যায়নান্তর ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি আইন ও সাহিত্য বিষয়ে স্নাতক উপাধি লাভ করেন। অতঃপর সংস্কৃতানুরাগী পিতার নিকট অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া তিনি সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করেন. এই সময় প্যারী নগরীতে সংস্কৃত শিক্ষার সবিশেষ সুযোগ ছিল। ইউরোপে প্যারীনগরীতেই (কলেজ দ্য ফ্রান্স) প্রথম সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ সৃষ্ট হয়। প্যারীর দৃষ্টান্ত অনুসরণে পরে ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলিতেও সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ সৃষ্ট হইয়াছিল। কলেজ দ্য ফ্রান্সের তৎকালীন সংস্কৃত অধ্যাপক দ্য শেজি ও স্বীয় পিতার নিকট সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করিয়া বিউরণুফ স্বীয় মেধার সাহায্যে অচিরকালের মধ্যেই সংস্কৃত ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। সংস্কৃত ভাষার চর্চা বিউরণুফকে এতদূর আকৃষ্ট করিয়াছিল যে তিনি পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী আইন ব্যবসায় বৃত্তি গ্রহণ না করিয়া সংস্কৃত তথা প্রাচ্য-বিদ্যার সেবায় জীবন অতিবাহিত করিতে মনস্থ করেন। সার্থক আইনজীবীর যে সব গুণাবলী আবশ্যক তাহার সবগুলিই বিউরণুফের আয়ত্ত ছিল, আইন ব্যবসায়কে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করিলে অচিরকালের মধ্যেই তিনি প্রভূত সাফল্য লাভ করিতে পারিতেন। ধন-মান লাভের এই সহজ পথে অগ্রসর না হইয়া বিউরণুফ সংস্কৃত তথা প্রাচ্য বিদ্যা-চর্চার দারিদ্রাসঙ্কুল পথই বাছিয়া লইয়াছিলেন।

১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ক্রিশ্চিয়ান লাজেনের সহযোগিতায় পালিভাষা সম্বন্ধে বিউরণুফের একটি নিবন্ধ পুস্তক প্রকাশিত হয়। (এসে সুর লু পালি)। এই সময়ে ইউরোপে পালিভাষা একরূপ অপরিজ্ঞাত ছিল। অনেকেই পালি ভাষাকে পাহ্লবী বা ঐ জাতীয় ভাষার নামান্তর বলিয়া মনে করিতেন। ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার সাহায্যে এই নিবন্ধে বিউরণুফ্ প্রমাণিত করেন যে সিংহল, ব্রহ্ম ও শ্যামদেশের ধর্মশাস্ত্রে ব্যবহৃত এই ভাষা সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত। সংস্কৃত ব্যাকরণ বিশেষতঃ পাণিনি ব্যাকরণে অসাধারণ ব্যুৎপত্তির জন্য বিউরণুফ তাঁহার সিদ্ধান্তের সমর্থনে অকাট্য প্রমাণ প্রদর্শন করেন। এই নিবন্ধ প্রকাশের পর তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বিস্তৃত হয়। পর বৎসর পালি ব্যাকরণ সম্বন্ধে তাঁহার আর একটি পুস্তক প্রকাশিত হয়। বিউরণুফের পালিভাষা ও বৌদ্ধধর্মানুরাগ জীবনের শেষ ভাগ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ফরাসী ভাষায় লিখিত তাঁহার ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস (য়্যাঁট্রোডুসিও আ লীস্তোয়ার দা বুদ্ধিসম্ য়্যাঁড়িয়া) প্রকাশিত হয়। প্যারীর এসিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত নেপাল হইতে সংগৃহীত ৮৮টি বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক পুঁথি অবলম্বনে এই গ্রন্থ রচিত হয়। এই পুস্তকে বিউরণুফ বৌদ্ধধর্মের কাল সঠিক ভাবে নিরূপিত করেন, বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে এযাবৎ অজ্ঞাত বহু তথ্যে পুস্তকখানি সমৃদ্ধ। পালি ভাষায় লিখিত বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থ সদ্ধর্ম পুণ্ডরীকের বিউরণুফ কৃত ফরাসী অনুবাদ (লু লটুস্ দা লা বন লোয়া) ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পালিভাষার একটি ব্যাকরণ ও বিউরণুফ কর্তৃক রচিত হয় এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হয় নাই।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে প্যারীর নর্মাল বিদ্যালয় হইতে তুলনামূলক ব্যাকরণ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য বিউরণুফকে আহ্বান করা হয়। ১৮২৯ হইতে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে এই চারি বৎসর ধরিয়া বিউরণুফ তুলনামূলক ব্যাকরণ সম্বন্ধে এই বিদ্যালয়ে নিয়মিত বক্তৃতা দেন। বিউরণুফের এই বক্তৃতাগুলি প্রকাশিত হয় নাই, তবে তাঁহার রচিত ৪৫০ পৃষ্ঠাব্যাপী নোট বহুবৎসর যাবৎ এই বিদ্যালয়ে রক্ষিত ও ছাত্রগণ কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে তিনি একাডেমি অব্ ইন্সক্রপশনের সদস্যপদ লাভ করেন, উত্তরকালে তিনি এই বিদ্বৎ প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক নির্বাচিত হন, নির্বাচনের এই সর্ত ছিল যে বিউরণুফ যতদিন জীবিত থাকিবেন ততদিন আর অন্য কাহাকেও সম্পাদক নির্বাচিত করা হইবে না।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে তদীয় শিক্ষাগুরু দা-সেজির স্থলে তাঁহাকে কলেজ-দ্য ফ্রান্সে সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। আমরণ এই কলেজে বিউরণুফ সংস্কৃতের অধ্যাপনা করিয়া গিয়াছেন।

বিউরণুফের বহুমুখী প্রতিভা ও বিস্তৃত বিদ্যা বৈভব শুধু সংস্কৃত ও পালির চর্চাতেই নিবদ্ধ থাকে নাই। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে তিনি জরথুস্ত্র ধর্ম পুস্তক (পার্শী) জেন্দ-অবেস্তার একাংশের এক সুবিস্তৃত টিকা প্রকাশ করেন। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে দুপেরো জেন্দ্ অবেস্তার ফরাসী অনুবাদ প্রকাশ করেন। অবেস্তার পুঁথি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র দুপেরো মৃত্যুর পূর্বে প্যারীর সরকারী পাঠাগার-বিব্লিওথেক ন্যাশানেলে গচ্ছিত রাখিয়া যান। দুপেরো মূল জেন্দ্ ভাষার সহিত পরিচিত ছিলেন না। যে সমস্ত পার্শী পণ্ডিতের সহায়তায় দুপেরো অবেস্তার ফরাসী অনুবাদ সম্পন্ন করেন তাঁহারাও মূল জেন্দ-ভাষা জানিতেন না। অবেস্তা রচনা কালে উহা যে ভাষায় লিখিত হয় তাহা সাধারণতঃ জেন্দ নামে পরিচিত, সুপ্রাচীনকালে খৃষ্ট জন্মের বহু পূর্বে পাহ্লবী ভাষা জেন্দ্ এর স্থান অধিকার করে। খৃষ্টিয় দশম শতাব্দীতে ইরাণে (পারস্য) ইসলাম ধর্ম প্রবল হইয়া উঠিলে জরথুস্ত্রী উপাসক ইরাণীয়েরা ব্যাপকভাবে দেশত্যাগ করিতে থাকেন। ইহাঁদের একটি শাখা ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে ভারতবর্ষে আসিয়া বোম্বাই-সুরাই অঞ্চলে বাস করিতে থাকেন। বর্তমানে ইহাঁদের বংশধরেরাই পার্শী নামে ভারতবর্ষে পরিচিত। জরথুস্ত্রপন্থীদের যাযাবর অবস্থায় অবেস্তার বহু অংশ লুপ্ত হইয়া যায়। বাকী অংশের পাহ্লবী রূপই ভারতে উপনিবিষ্ট পার্শী সম্প্রদায়ের উপজীব্য হয়। দুপেরো কৃত অবেস্তার ফরাসী অনুবাদ স্থলেতঃ অবেস্তার এই পাহ্লবী অনুবাদ অবলম্বনেই লিখিত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে নিরওনসেঙ্গ নামক এক পণ্ডিত লিখিত অবেস্তার খণ্ডাংশ যন্নের (পাহ্লবী হইতে) একটি সংস্কৃত অনুবাদ দৈবক্রমে বিউরণুফের অধিগত হয়। এই সংস্কৃত অনুবাদ দৈবক্রমে অবলম্বন করিয়া বিউরণুফ খৃঃ পূর্ব পঞ্চম ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রচলিত অবলুপ্ত মূল জেন্দ্ ভাষাকে পুনরুদ্ধার করেন। দুপেরো রচিত অবেস্তার ফরাসী অনুবাদ, নেরিও সেঙ্গের সংস্কৃত অনুবাদ ও বিব্লিওথেক ন্যাশনালে রক্ষিত এ যাবৎ অপঠিত মূল জেন্দ্ ভাষায় লিখিত পুঁথিগুলি হইতে সমস্ত জেন্দ্ ভাষার শব্দগুলি বাছিয়া লইয়া প্রতিটি শব্দের ব্যুৎপত্তি তুলনামূলক ভাষা-বিজ্ঞান ও ব্যাকরণের আলোকে তিনি গবেষণা করিতে থাকেন। ভাষা বিজ্ঞানে অতুলনীয় পার-দর্শিতার ফলে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে জেন্দ্-ভাষা সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত হয় নাই, বেদের সমকালীন এই জেন্দ-ভাষা বৈদিক (সংস্কৃত ভাষা) ও গ্রীক, ল্যাটিন, জর্মান প্রভৃতি আদিম আর্য গোষ্ঠীর ভাষা সমূহের সহিত একই পরিবার ভুক্ত। ভাষা বিজ্ঞানে বিউরণুফের এই গবে-ষণা চিরস্মরণীয়। অবেস্তার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত জেন্দ্ শব্দাবলীর এক বিস্তৃত তালিকা ও বিউরণুফ রচনা করেন। জেন্দ-ভাষার পুনরুজ্জীবন ও পুনঃ প্রতিষ্ঠার ব্যতীত বিউরণুফ অবেস্তার অপর

অংশ ভেণ্ডিদাদ্ সাদের একটি সংস্করণ খণ্ডশঃ মূল প্রতিলিপিসহ প্রকাশ করেন (১৮২৯-৪৩)।

বিউরণুফ কৃত ভাগবতপুরানের মূল সংস্কৃত ও ফরাসী অনুবাদ তিনখণ্ডে ১৮৪০ হইতে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্যারী হইতে প্রকাশিত হয়।

বৈদিক সংস্কৃত, পালি ও অবেস্তার চর্চায় বিউরণুফের সমগ্র জীবন উৎসর্গীকৃত ছিল। তিনি নিজেকে বেদ পন্থী ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ অথবা জরথুস্তভক্ত বলিয়া গণ্য করিতেন।

ব্যক্তিগত জীবনে প্রাচ্য বিদ্যার চর্চা ব্যতীত বিংশ বর্ষ যাবৎ কলেজ দ্য ফ্রান্সে বিউরণুফ সংস্কৃতভাষার অধ্যাপনা করিয়া গিয়াছেন। এই সময়ে তিনি ছিলেন ইউরোপে বৈদিক সাহিত্য ও ভাষা চর্চার প্রধান পুরোহিত। তাঁহার উদ্দীপনাময় অধ্যাপনায় আকৃষ্ট হইয়া যাঁহারা বৈদিক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করিয়া জগদ্ব্যাপী খ্যাতিলাভ করেন তাঁহাদের মধ্যে রুডলার রথ ও ম্যাক্সমূলরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিউরণুফ শিষ্য রুডলার রথের নেতৃত্বে জার্মানীতে বৈদিক চর্চা প্রবর্তিত হয়। বিউরণুফের নিকট অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াই ম্যাক্সমূলর সায়নভাষ্য সহ ঋগ্বেদের সম্পাদনায় আত্ম নিয়োগ করেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে যুবক বিদ্যার্থীরূপে ম্যাক্সমূলর প্যারীতে বিউরণুফের সংস্পর্শে আসেন। বিউরণুফের উদার, নিরভিমান ব্যবহার, মহৎ চরিত্র ও বিশেষভাবে তাঁহার সুগভীর প্রাচ্য-বিদ্যানুরাগ ম্যাক্সমূলরকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। বিউরণুফের আবেগদীপ্ত প্রাঞ্জল অধ্যাপনায় ম্যাক্সমূলরের সম্মুখে এক অপূর্ব জ্ঞান ভাণ্ডারের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করিয়া ফেলেন। বৈদিক ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে নিজের গবেষণা প্রসূত সিদ্ধান্ত ও ভারতবর্ষ হইতে বহু আয়াসে সংগৃহীত পুঁথি পত্রগুলি নবলব্ধ শিষ্যের হস্তে সমর্পণ করিয়া গুরু বিউরণুফ ম্যাক্সমূলরকে ভারতীয় দর্শন ও ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন ও সায়ন ভাষ্য সহ ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি অনুবাদ সহ প্রচার করিতে অনুরোধ করেন। একবিংশতি বর্ষীয় তরুণ ম্যাক্সমূলর গুরুর এই নির্দেশকে জীবন-ব্যাপী সাধনার দ্বারা সম্পাদিত করিয়াছিলেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে আসিয়া ম্যাক্সমূলর তাঁহার কার্য আরম্ভ করেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্সমূলর কৃত ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। গুরুর নিকট যে উৎসাহ ও সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন অকুণ্ঠিতচিত্তে ম্যাক্সমূলর এই পুস্তকের ভূমিকায় তাহার উল্লেখ করেন। বিউরণুফের মৃত্যুর অল্পকাল পর ঋগ্বেদের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। এই খণ্ডের ভূমিকায় বিউরণুফের মৃত্যুর উল্লেখ করিয়া সাতিশয় ক্ষোভের সহিত ম্যাক্সমূলর লেখেন — "বিউরণুফের মৃত্যুতে প্রাচ্য বিদ্যার ক্ষেত্র একজন অক্লান্ত সাধককে হারাইয়াছে, আর আমরা হারাইয়াছি একজন নিঃস্বার্থ গুরু ও দিগ্‌দর্শক। তাঁহার শুভেচ্ছা ও সমর্থন সর্বদাই ছিল আমাদের কাম্য। সত্যনিষ্ঠ এই মহামনীষীর প্রতিকূল সমালো-চনার আশঙ্কায় আমরা সর্বদাই আমাদের সাধনায় অভ্রান্ত থাকিবার চেষ্টা করিতাম। তাঁহার তিরোধানে মনে হইতেছে আমাদের কাজে উৎসাহ অনুপ্রেরণা আর কাহার নিকট পাইব? বিউরণুফের মৃত্যুতে কাজের আকর্ষণ আমাদের কাছে বহুল পরিমাণে মন্দীভূত হইয়া গিয়াছে।

আমি জানি ইউরোপের বহু বিদ্যাব্রতীরও ইহাই আজ মনের কথা। প্রথমখণ্ড সমাপনান্তে আমার মনে এই চিন্তার উদয় হইয়াছিল দেখা যাক্ আচার্য বিউরণুফ আমার এই প্রথমখণ্ড দেখিয়া কি বলেন। আজ যখন ঋগ্বেদের এই দ্বিতীয় খণ্ড আমি বিদ্বদ্‌মণ্ডলীর নিকট নিবেদন করিতেছি তখন আমার চিন্তা বিউরণুফের স্মৃতিকে কেন্দ্র করিয়াই আবর্তিত হইতেছে, যিনি আর আমাদের মধ্যে নাই।"

সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যের কৃতী অধ্যাপক, ম্যাক্সমূলর ও রথের ন্যায় দিগ্বিজয়ী মনীষীর

পথ প্রদর্শক গুরু, ভাগবতপুরাণের অনুবাদক বিউরনুফ পালিভাষা, বৌদ্ধধর্ম ও জেন্দ্ ভাষাকে বিস্মৃতির অতল গহ্বর হইতে পুনরুদ্ধার করেন। বিউরনুফের মনীষার দীপ্তিতে বহুমনীষীর প্রতিভার আলোকে উদ্ভাসিত ফরাসীদেশের সম্মান ইউরোপে আরও বর্দ্ধিত হয়। জাতির মর্যাদা বর্দ্ধনের স্বীকৃতি হিসাবে ফরাসী গভর্ণমেন্ট তাঁহাকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজকীয় সম্মান "অফিসিয়ে দ্য লা লুজি ও দ্যানার" পদবীতে ভূষিতে করেন। দেশ বিদেশের বহু বিদ্বৎ প্রতিষ্ঠানও তাঁহাকে সম্মানিত সদস্যভুক্ত করিয়া নিজেদের গৌরবান্বিত করে।

খ্যাতি প্রতিপত্তির চরম শিখরে সমাসীন বিউরনুফ ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ২৮শে মে তারিখে মাত্র একান্ন বৎসর বয়সে প্যারীনগরীতে প্রাণত্যাগ করেন। জীবনব্যাপী নিরলস পরিশ্রমই তাঁহার অকাল মৃত্যুর কারণ। বিউরনুফের অকাল বিয়োগে জগতের পণ্ডিত মণ্ডলী কি পরিমাণে ক্ষুব্ধ ও ক্ষতিগ্রস্থ বোধ করিয়াছিল ঋগ্বেদের দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় পণ্ডিতচূড়ামণি ম্যাক্সমুলরের খেদোক্তিতেই তাহা সবিশেষ পরিস্ফুট হইয়াছে।

মডিগ্লিয়ানি

জীবনীকারের কাছে আমরা কী আশা করবো? ঘটনা পুঞ্জের বিবৃতি ও ঐতিহাসিক তথ্য নিরূপণ? না সুখে দুঃখে স্পন্দিত একটি জীবন কাহিনী?

ব্যক্তিগত ভাবে জীবনীকারের কাছে আমার প্রত্যাশা একটি জীবনকাহিনী—যা জীবন বটে—কিন্তু কাহিনীও। যা সুখদুঃখে প্রাণের স্পন্দনে স্পন্দিত। ঘটনাপুঞ্জের বিবৃতির জন্য বা ঐতিহাসিক তথ্য নিরূপণের জন্য ঐতিহাসিক রয়েছেন। অবশ্য একথা বলছি না যে জীবন কাহিনীতে তথ্যের কোন স্থান নেই—নিশ্চয়ই আছে। তথ্যকে আশ্রয় করেই তো সত্য। কিন্তু শুধুমাত্র তথ্য পরিবেশন করেই জীবনীকারের কর্তব্য শেষ হয় না। সে তথ্যকে আশ্রয় করে বর্ণিত ব্যক্তির জীবনটি কাহিনীর সরসতা নিয়ে ফুটে ওঠা চাই—তার ব্যক্তিসত্তার প্রকাশ হওয়া চাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে জীবনী সাহিত্য রচনার জন্য উপযুক্ত সাহিত্যিক অন্তর্দৃষ্টি না থাকলেও অনেকে শুধু তথ্য ও জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে জীবনী রচনা করেন। ফলে তা নেহাৎ থীসিস মাত্রে পর্যবসিত হয়—পাঠকের প্রত্যাশা পূরণ করেনা। সম্প্রতি জীন মডিগ্লিয়ানি রচিত তাঁর পিতা প্রখ্যাত চিত্রকর আমেদিও মডিগ্লিয়ানির জীবনী পড়ে একথাই বার বার মনে হয়েছে।

আধুনিক চিত্রকলার ইতিহাসে মডিগ্লিয়ানির স্থান পুরোভাগে। ইতালীয় এই চিত্রকর ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে লেঘহর্ণ শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর জীবনের প্রথম কয়েকটা বছর ইতালীতেই কাটে এবং সেখানেই তিনি চিত্রাঙ্কন অনুশীলন করতে থাকেন। ১৯০৬ সালে তিনি প্রথম প্যারিসে আসেন। প্যারিস ছিল তখনকার সমগ্র ইয়োরোপের আধুনিক ও বিদ্রোহী সাহিত্যিক ও শিল্পীদের আশ্রয়স্থল। সেখানেই ভাস্কর্য ও চিত্রকলার মাধ্যমে তাঁর শিল্পীসত্তা নিজেকে প্রকাশ করতে থাকে। ১৯২০ সালে প্যারিসেই তিনি মারা যান।

সংক্ষেপে এই হোল মডিগ্লিয়ানির জীবনের ঘটনা। কিন্তু তাঁর শিল্পীসত্তা যেমন জীবনের একটি দিক তেমনি অন্য আর একটি দিকও আছে। সেদিকে মডিগ্লিয়ানি ছিলেন মদ্যপ ও উচ্ছৃংখল।

মানবমনের একটি বিশেষত্ব হোলো যে প্রতিভার ক্ষেত্রে বহু পদস্খলন, বহু ত্রুটিকেই সে ক্ষমার্হ বলে মনে করে এবং শুধু তাই নয়, এসকল ত্রুটি বিচ্যুতির জন্যই যেন প্রতিভাধর ব্যক্তি এক রোমান্টিক আলোতে আলোকিত হন। প্রতিভার ক্ষেত্রে চিরাচরিতের ব্যতিক্রমই আমরা আশাকরি এবং সেজন্য হয়তো এই ত্রুটি ও পদস্খলনগুলিকে প্রতিভারই একটি চিহ্ন বলে মনে করি। মডিগ্লিয়ানির ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। তাঁর প্রতিভা ও পদস্খলনকে একসূত্রে গ্রথিত করে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে যার মূলে কোন সত্য নেই। শ্রীমতী জীন মডিগ্লিয়ানি তাঁর গ্রন্থের সূচনাতেই বলেছেন যে আবিষ্কার করাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য।

বলতে দ্বিধা নেই যে শ্রীমতী মডিগ্লিয়ানি তথ্যপরিবেশনে সমর্থ হলেও তাঁর পিতার সত্যকারের জীবনী রচনা করতে অসমর্থ হয়েছেন। প্রচলিত বহুধারণাকে তিনি ভাঙতে সমর্থ

হয়েছেন বটে, কিন্তু তার পরিবর্তে নতুন কোন ধারণা জন্মাতে সাহায্য করেন নি। ভালোমন্দয় মেশানো মানুষ মডিগ্লিয়ানির পরিচয় আমরা এতে পাইনি। অপরপক্ষে মডিগ্লিয়ানি সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা বিনষ্ট হওয়াতে মনে শূন্যতা জাগে। লেখিকা সে শূন্যতা পূরণ করতে হয় অপারগ ছিলেন নয়তো অনিচ্ছুক। বইটির অধিকাংশই মডিগ্লিয়ানি সম্বন্ধে অন্যান্য জীবনীকার ও শিল্পীর বন্ধুবান্ধবদের নানা উক্তির খণ্ডন মাত্রে পর্যবসিত হয়েছে। কিন্তু পরিবেশিত কোন তথ্য বা লেখিকার কোন উক্তিই মডিগ্লিয়ানিকে বুঝতে সাহায্য করে না। তাঁর চরিত্রের আপাতবিরোধীতার কোন ব্যাখ্যা দিতেও চেষ্টা করেন নি লেখিকা। অথচ মডিগ্লিয়ানির জীবন নিয়ে একটি সার্থক জীবনীসাহিত্য রচিত হতে পারতো। এ প্রসংগে আর্ভিংস্টোন রচিত ভ্যান গগের জীবনী "লাস্ট ফর লাইফের" কথা স্মরণীয়। আর্ভিংস্টোনও ঐতিহাসিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই জীবনী রচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর সাহিত্যিক অন্তর্দৃষ্টির ফলে এবং পরিবেশনের গুণে বইটি বহু প্রথম শ্রেণীর উপন্যাসের চেয়েও সুখপাঠ্য হয়েছে। শুধু তাই নয়, বইটি ভ্যানগগকে বুঝতেও সাহায্য করে।

কিন্তু সবক্ষেত্রে তথ্যও বিস্তারিতভাবে পরিবেশন করেননি লেখিকা। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে লেখিকার মাতা Jeane Hébuturne এর সংগে মডিগ্লিয়ানির গভীর প্রেমের ইতিহাস বর্ণনা নিশ্চয়ই লেখিকার সাধ্যাতীত ছিল। Jeane Hébuturne এর সাহচর্য ও প্রেমের প্রভাব মডিগ্লিয়ানির ব্যক্তিগত জীবনে ও শিল্প জীবনে পড়েছিল কী না সে সম্বন্ধেও লেখিকা নীরব। এ প্রসংগে উল্লেখ করা যেতে পারে যে মডিগ্লিয়ানির সংগে Jeane Hébuturne এর আলাপ হয় মাত্র ১৯১৭ সালে এবং ১৯২০ সালে মডিগ্লিয়ানির মৃত্যুর পরদিনই ভদ্রমহিলা আত্মহত্যা করেন। এঁর সংগে আলাপ হওয়ার পূর্বে মডিগ্লিয়ানির জীবনে একাধিক নারীর আগমন ঘটেছে—কিন্তু তাদের সংগে শিল্পীর অন্তর সম্বন্ধ ছিল কী না তাও লেখিকা বলেন নি। মডিগ্লিয়ানির বন্ধু ও প্রধান সাহায্যকারী Zborowski এর সংগে তাঁর সম্বন্ধেরও একটু বিশদ বিবরণ আশা করেছিলাম।

কিন্তু এসব ত্রুটিও উপেক্ষণীয় হোতো যদি বইটিতে মডিগ্লিয়ানির শিল্প কলা সম্বন্ধে কোন সুসংবদ্ধ আলোচনা থাকতো। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেদিকেও লেখিকা আমাদের হতাশ করেছেন। অবশ্য নানা প্রসংগে তিনি মডিগ্লিয়ানির চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের নানা বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন—কিন্তু সুসংবদ্ধ আলোচনা অনুপস্থিত। মডিগ্লিয়ানির শিল্পের বিকাশের ধারাটিও তুলে ধরা হয় নি। তাঁর শিল্পকলার ওপর ইতালীয় শিল্পের প্রভাব সম্বন্ধে খানিকটা আলোচনা করা হয়েছে বটে, কিন্তু তাও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উর্ধ্বতিতেই সীমাবদ্ধ।

এক কথায় বলা যায় যে শিল্পীর কন্যার দ্বারা রচিত বলে বইটি যেমন আগ্রহের সংগে পড়তে সুরু করেছিলাম—ঠিক ততখানিই হতাশ হয়েছি। হয়তো তথ্যের দিক দিয়ে বইটি ভবিষ্যৎ জীবনীকারের কাজে আসবে। কিন্তু শিল্পরসপিপাসু পাঠকের প্রত্যাশা পূরণ হবেনা —অবশ্য একদিক ছাড়া। তা হচ্ছে এই বইটিতে সংযোজিত চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের প্রচুর প্রতিলিপি। —এদেশীয় শিল্পরসপিপাসুরা অনেকেই মডিগ্লিয়ানির মূল সৃষ্টি দেখবার সুযোগ পাবেন না। তাই সার্থক প্রতিলিপিতেই তাদের ক্ষুধা মেটাতে হবে।

যে চিত্রকর তাঁর স্বল্পস্থায়ী জীবনে প্রতিভার আলোকে দীপ্ত হয়ে জ্বলেছিলেন ভবিষ্যতে তাঁর পূর্ণতর ও সার্থক জীবনী রচিত হবে এই আশাই করছি।

মীরা দত্ত

রবীন্দ্র রচনা সূচী

সাময়িক পত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনার সূচী

গত বৈশাখ সংখ্যায়, বঙ্গবাণী মাসিক পত্রে মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের রচনার সূচী প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমান সংখ্যা থেকে, বিচিত্রা মাসিক পত্রে মুদ্রিত রবীন্দ্র-রচনার সূচী ক্রমশ প্রকাশিত হবে।

বিচিত্রা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৩৪ সালের আষাঢ় মাসে, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদকতায়।

এইরূপ তালিকায় ত্রুটি থেকে যাবার বিশেষ সম্ভাবনা—পাঠকদের প্রতি অনুরোধ, যদি কেউ কোনো ভ্রম লক্ষ করেন তবে তা যেন অনুগ্রহপূর্বক সংকলয়িতাদের গোচরীভূত করেন। এই তালিকায় রচনার নামের পরে, রচনাটি রবীন্দ্রনাথের যে-গ্রন্থভুক্ত হয়েছে তার উল্লেখ করা হয়েছে। যদি গ্রন্থভুক্ত না হয়ে থাকে, তবে 'অপ্রকাশিত' বলে তা নির্দেশ করা হয়েছে। গানগুলি সবই গীতবিতান-ভুক্ত, এক্ষেত্রে গ্রন্থের নাম স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হল না।

বিচিত্রা

প্রথম বর্ষ ॥ আষাঢ় ১৩৩৪—জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫

আষাঢ় ১৩৩৪

বিচিত্রা
কবির হস্তাক্ষর-প্রতিলিপি
পরিশেষ
নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা
কবির হস্তাক্ষর-প্রতিলিপিতে "ভূমিকা"-সহ
শ্রীনন্দলাল বসু চিত্রিত
বনবাণী
স্বরলিপি
গগনে গগনে আপনার মনে
স্বরলিপি। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রাবণ ১৩৩৪ সংখ্যায় সংশোধন প্রকাশিত
স্বরবিতান ২

শ্রাবণ ১৩৩৪

হাসির পাথেয়
বনবাণী
সাহিত্য-ধর্ম
সাহিত্যের পথে
মধু-মঞ্জরী

বনবাণী
নীলমণি লতা
বনবাণী
কুহু চি
বনবাণী
ভানুসিংহের পত্রাবলী
প্রতি মাসে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত এবং ১৩৩৫ আষাঢ় সংখ্যায় সমাপ্ত
ভানুসিংহের পত্রাবলী
স্বরলিপি
আমায় ক্ষম হে ক্ষম
স্বরলিপি। সাহানা দেবী
স্বরবিতান ২। স্বরলিপি : দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভা দ্র ১ ৩ ৩ ৪
খেলা-ঘর
'আপন মনে গোপন কোণে'
গান
লেখন
চারটি কবিতা কবির হস্তাক্ষর-প্রতিলিপি
লেখন
স্বরলিপি
নৃত্যের তালে তালে
স্বরলিপি। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
স্বরবিতান ২। পরবর্তিত মুদ্রণে 'নমো নমো.....' অংশের স্বরলিপি যোজিত

আ শ্বি ন ১ ৩ ৩ ৪
মধুর
কবির হস্তাক্ষর-প্রতিলিপি
বনবাণী, চামেলী-বিতান
পরদেশী
কবির হস্তাক্ষর-প্রতিলিপি
বনবাণী
তিন-পুরুষ
প্রতি মাসে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত এবং ১৩৩৫ চৈত্র সংখ্যায় সমাপ্ত। অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ হইতে নাম পরিবর্তিত
যোগাযোগ
জাভা-যাত্রীর পত্র
প্রতিমাসে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত এবং ১৩৩৪ চৈত্র সংখ্যায় সমাপ্ত
যাত্রী
রবীন্দ্রনাথের পত্র

প্রমথ চৌধুরীকে লেখা
চিঠিপত্র ৫, পৃ ২৪৯
স্বরলিপি
কেন পান্থ এ চঞ্চলতা
স্বরলিপি। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
স্বরবিতান ১

কা র্তি ক ১ ৩ ৩ ৪
দেবদারু
কবির হস্তাক্ষর-প্রতিলিপি
বনবাণী
যাবার দিকের পথিক
কবির হস্তাক্ষর-প্রতিলিপি
মহুয়া, বিদায়সম্বল
শেষ স্তবক বর্জিত। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫, গ্রন্থপরিচয় দ্রষ্টব্য
স্বরলিপি
আলোর অমল কমলখানি
স্বরলিপি। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
স্বরবিতান ২

অ গ্র হা য় ণ ১ ৩ ৩ ৪
অবুঝ মন
পরিশেষ
গ্রন্থে গদ্যভূমিকা বর্জিত। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫, গ্রন্থপরিচয়ে গদ্যভূমিকাটি মুদ্রিত
গ্রন্থে স্তবক সংস্থান কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত
তিন-পুরুষ
"নামান্তর"—উপন্যাসের নামান্তরের কৈফিয়ৎ
এই সংখ্যা হইতে উপন্যাসের নামকরণ হয় 'যোগাযোগ'
"নামান্তর" শ্রাবণ ১৩৪০ সংস্করণে ভূমিকারূপে এবং বর্তমানে পুস্তকের গ্রন্থপরিচয়ে মুদ্রিত
কর্মে মুক্তি
যাত্রী, জাভাযাত্রীর পত্র ৫
স্বরলিপি
হিমের রাতে ঐ গগনের
স্বরলিপি। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
স্বরবিতান ২

পৌ ষ ১ ৩ ৩ ৪
নূতন শ্রোতা
পরিশেষ
স্বরলিপি
হায় হেমন্তলক্ষ্মী, তোমার নয়ন কেন ঢাকা,

স্বরলিপি। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
স্বরবিতান ২
আমার মূর্তি পূর্ণ করি
শ্রীঅসিতকুমার হালদার কর্তৃক গঠিত কবির মূর্তি প্রসঙ্গে রচিত কবিতা। রচনার তারিখ ২৫ বৈশাখ ১৩৩৪
অপ্রকাশিত

মা ঘ ১ ৩ ৩ ৪
আরেক দিন
পরিশেষ
গ্রন্থে গদ্যভূমিকাটি বর্জিত। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫, গ্রন্থপরিচয়ে গদ্যভূমিকাটি মুদ্রিত
স্বরলিপি
শীতের বনে কোন্ সে কঠিন
স্বরলিপি। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
স্বরবিতান ২

ফা ল্গু ন ১ ৩ ৩ ৪
তে হি দিবসাঃ
পরিশেষ, তে হি নো দিবসাঃ
গ্রন্থে গদ্যভূমিকাটি বর্জিত। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫ গ্রন্থপরিচয়ে গদ্য ভূমিকাটি মুদ্রিত
স্বরলিপি
তোমার আসন পাতব কোথায়
স্বরলিপি। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
স্বরবিতান ২

পুলিনবিহারী সেন
পার্থ বসু

বৈশাখ ১৩৬৭ সংখ্যার শুদ্ধিপত্র
পৃঃ ৬৩
প্রথম লাইন **দ্বিতীয় লাইনের নীচে** বসিবে
ত্রয়োদশ লাইন : 'আদ্যত' স্থলে 'আদান্ত' পঠিতব্য
ষোড়শ লাইন : ১৩৩১ স্থলে ১৩৩৩ পঠিতব্য
চতুর্বিংশ হইতে সপ্তবিংশ লাইন চতুর্দশ লাইনের নীচে বসিবে
পৃঃ ৬৪
চতুর্বিংশ লাইন : ১৩২১ স্থলে ১৩২০ পঠিতব্য

স মা লো চ না

কালিদাসের কাব্যে ফুল ॥ সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ বুকল্যান্ড ॥ কলিকাতা। মূল্য ৪.

রাজনীতির ধূলিধূসরিত পথে চলতে চলতেও সাহিত্য সাধনা যে করা যায় এ ধারণা আমাদের দেশের মানুষের নেই। আমাদের ধারণা যারা রাজনীতি করে তারা সভাসমিতিতে চীৎকার করে, চাষীমজুরদের প্রতিষ্ঠান গড়বে, নিতান্তই যদি লিখতে হয় তা হলে রাজনীতির তত্ত্ব লিখবে। আর যারা সাহিত্য করে তারা রাজনীতির আসরে কখনোই গতায়াত করবেনা। সৌম্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেককেই এ মন্তব্য করতে শুনেছি যে রাজনীতির পথ ছেড়ে সংস্কৃতি চর্চার পথে যদি তিনি চলতেন তাহলে দেশের উপকার হতো। আমরা এ কথা স্বীকার করি নে। তাঁর অজস্র রাজনৈতিক রচনা তাঁর চিন্তার স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করছে রাজনীতির ক্ষেত্রে। সেখানে যেমন তাঁর মূল্য আছে তেমনি 'কালিদাসের কাব্যে ফুল' সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর মূল্য নতুন করে প্রমাণ করছে। ইতিপূর্বে লেখা 'যাত্রী' 'রবীন্দ্রনাথের গান' 'রাশিয়ার কবিতা', 'বিহারী সতসই' 'শরৎচন্দ্র দেশ ও সমাজ' প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁর সাহিত্যচর্চার নিদর্শন বহন করছে; রাজনীতির বাস্তবতার মধ্যেও তাঁর এই সাহিত্য সাধনার যে নতুন নতুন ফসল দেখা যাচ্ছে তাতে আমরা আশান্বিত হচ্ছি।

কবিদের ফুলের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। তাঁরা রূপের পূজারী এবং রূপস্রষ্টা। তাই ফুল তাদের চোখ ভোলায় মন ভোলায়। ফুলের কথা লেখেননি ফুলের সঙ্গে তুলনা দেননি এমন কবির নাম আমাদের জানা নেই। বিশেষ করে কালিদাসের মত প্রকৃতির রূপ-মুগ্ধ কবির কাব্যে যে ফুলের কথা নানা সুযোগে উঠবে এতো আশা করা যায়। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রচুর পরিশ্রমের দ্বারা কালিদাসের কাব্যের প্রাঙ্গণ তন্ন তন্ন করে খুঁজে কবির জানা এবং কাব্যে ব্যবহৃত সব কটি ফুলের সন্ধান করেছেন। কিন্তু শুধু পরিশ্রমই নয় তার চেয়ে বড় কথা ফুলগুলিকে কালিদাস কেমন করে কাজে লাগিয়েছেন নিজের রসদৃষ্টির দ্বারা তারও সমালোচনা লেখক করেছেন। কালিদাসের কাব্যে মাত্র একচল্লিশটি ফুল আছে—নাম না জানা, অখ্যাত, বনা গ্রামফুলগুলিকে তিনি মোটেই আমল দেননি। লেখক এর কারণ বিশ্লেষণ করে বলছেন "রাজ সভার কবি তিনি, যেন সঙ্কুচিত হচ্ছেন, ভয় পাচ্ছেন মেঠো ফুলকে, অখ্যাত ফুলকে তাঁর কাব্যে স্থান দিতে। রাজ-সভা কবির পক্ষে এমনি কাব্যঘাতিনী।" এরই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনা করে লেখক বলেছেন নানা ধরণের অনামা ফুলকে মর্যাদা দিয়ে একালের কবি তাদের সম্মান দিয়েছেন। "শাস্ত্রের কিংবা রাজ-দরবারের নির্দেশ মেনে ফুলের জাতবিচার রবীন্দ্রনাথ করেন নি। অ-শাস্ত্রীয় ফুলের দল তাঁর কাব্যে রসের জোয়ার বইয়ে দিয়েছে। কালিদাস এখানে হার মেনেছেন তাঁর সমগোত্রীয় এই মহাকবির কাছে।"

গ্রন্থের বিষয় বস্তু কৌতূহলোদ্দীপক। একচল্লিশটি ফুলের মধ্যে সকলের প্রতি কবির সমদৃষ্টি নয়। কাউকে সমগ্র কাব্যে একবার দুবার আবার কাউকে শতাধিক বার স্মরণ করেছেন। যেমন জপাকে স্মরণ করেছেন মাত্র একবার। মেঘদূতে সন্ধ্যার রক্তবর্ণ বোঝাতে জপার ডাক পড়েছে তারপর কবির কাব্যে তার আর স্থান হয়নি। আর তার পাশেই কবির অত্যন্ত আদরের ফুল

পদ্ম কাব্যে স্থান পেয়েছে একশো বাইশবার। অধুনাতন ফুলের সঙ্গে যার পরিচয় কোনমতেই মেলানো যাচ্ছেনা এমন ফুল হচ্ছে সিন্ধুবার—মুক্তার মতো শুভ্র—"মুক্তাকলাপাকৃত সিন্ধুবারং।" এরও স্থান একবারই। যে ফুল আদরের, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যে অত্যন্ত ভালবাসা ও স্নেহ পেয়েছে তাকে এক কথায় কালিদাস অতি সংক্ষেপে সেরে দিয়েছেন ঋতুসংহারে একবার মাত্র উল্লেখ করে—তার নাম শেফালী। আবার অতিপরিচিত ভূঁইচাপা কবির কাব্যে শিলীন্ধ্রা নামে আত্মগোপন করেছে। সৌদাল প্রাচীন কর্ণিকারের আধুনিক রূপ। অনেক নাম না জানা তুচ্ছ ফুল কবির কাব্যে জায়গা পায়নি কিন্তু আশ্চর্য ফাঁক পেয়ে গেছে বেতস মঞ্জরী। লেখক বলছেন "ভেবে পাই না কি করে বেতস তরুর মঞ্জরী মহাকবির মন পেলো! বেতের ব্যবহার রাজসভায় নিশ্চয়ই ছিল কিন্তু বেতস-মঞ্জরীর ব্যবহার তো রাজ অন্তঃপুরে ছিল বলে জানিনা।" কাব্যের যেখানে যেখানে ফুলগুলির ব্যবহার সেই অংশের কাহিনীটুকু তুলে দেওয়ায় কবির প্রয়োগকৃতিত্বও আমরা উপলব্ধি করতে পারি।

কালিদাসের কাব্যাংশগুলির বাংলা কবিতায় লেখক অনুবাদ করেছেন। এই অনুবাদগুলি সর্বত্র সমান সুন্দর হয়নি। কোনটি অতি কঠিন ও অসরল ছন্দপতনের দোষে একান্ত দুষ্ট—যেমন—

স্বর্ণকমল পরাগবাসিত মানসের জল পিয়া
ঐরাবতের মুখপরে রচো ক্ষণিকের আবরণ
কল্পতরুর কিশলয়গুলি রেশমীবিস্তসম মৃদু কাঁপাইয়া,
ললিত বিলাসে কৈলাসে তুমি ভোগ করো অনুখন।

এমন আরও কিছু কিছু অংশ তুলে দেখানো যেতে পারে যেখানে অনুবাদগুলি অত্যন্ত কষ্টকৃত হয়েছে।

এই ত্রুটিটুকু বাদ দিলে 'কালিদাসের কাব্যে ফুল' বাংলা আলোচনা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজনী। তথ্য ও রস উভয়েই এর সমৃদ্ধি।

প্রকাশকের কর্তব্য যথাযথ পালিত হয়েছে কিন্তু একটি কথা বলা দরকার—প্রচ্ছদপটটি অতিরিক্ত বর্ণাঢ্য হওয়ায় যেন কিছু হাল্কা হয়ে গেছে।

সোমেন বসু

সাম্প্রতিক স্বনির্বাচিত কবিতা ॥ হরপ্রসাদ মিত্র। সুরভি প্রকাশনী। মূল্য তিন টাকা।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালের ইংরেজি কবিতার মধ্যে যে অনতিক্রম্য ব্যবধান লক্ষ্য করা যায়, তার মূলে আছে জীবনবোধের পরিবর্তন, এ-কথা সকলেই জানেন। কিন্তু কবিতায় কোন্ বিশিষ্ট লক্ষণে তা আভাসিত হয়েছে—এ প্রশ্নের সর্বসম্মত উত্তর পাওয়া কঠিন। আধুনিকতার বিশিষ্ট চেহারা কী, তা এককথায় বলা কঠিন এবং সংজ্ঞানির্ণয় আরো কঠিন। তত্রাচ বিদগ্ধ কাব্যরসিকরা মনে করেন, প্রতীকধর্মিতা, মননপ্রাধান্য ও হৃদয়বৃত্তির কঠিন সংযমে তা আভাসিত। প্রতীকধর্মিতাই এক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সিম্বল বা প্রতীক কবি-মানসের স্বাতন্ত্র্যের পরিচায়ক; সে স্বাতন্ত্র্য কবিতার দেহে ও মনে, কাব্যপ্রসাধনে ও চিন্তনে, উপমাপ্রয়োগে, চিত্রকল্প রচনায়, ভাঙা ছন্দে, বাহ্যত সুরবিরোধিতায়—স্বতন্ত্র কাব্যভাষায়—সব মিলিয়ে কবির অতিশয় স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বে। পলায়নপর ক্ষণ মুহূর্তের দীপ্তি ও অস্পষ্ট কাব্য-

ভাবনাকে রূপদানের সাধনাই আধুনিক কবির সাধনা। প্রচলিত কাব্যরীতি-ভাষা-উপমা-চিত্র-কল্প বর্জন করে তাই নোতুনের সন্ধানে আধুনিক কবিকে বেরোতেই হয়। ইংরেজি কবিতায় এলিঅট ও ইয়েটস্-এ তার প্রথম আভাস পাই। বাংলা কবিতায় 'তিরিশের' যুগে তার প্রথম পরিচয় প্রকাশিত।

কবির ব্যক্তিত্বের ছাপ—তাঁর মনের নানা চোরাগলির নানা খণ্ড বিক্ষিপ্ত ভাবনা—তাঁর কল্পচেতনা ও যুগচেতনায়—তাঁর প্রকৃতিবোধ ও অধ্যাত্মজিজ্ঞাসায়—বিশিষ্ট রূপে প্রকাশিত। এই সব নিয়েই কবির ব্যক্তিত্ব এবং তার সত্য প্রকাশে কবি স্বতন্ত্র মহিমায় দীপ্যমান, একথা অবশ্যস্বীকার্য। সুতরাং আধুনিক কবিরা এক স্তরের নন, এক ভাবনার পথিক নন, এবং 'সমকালীন কাব্যরীতি' বলে সর্বগ্রাহ্য কোনো রীতি থাকতে পারে না, একথাও অনস্বীকার্য। আমরা এই কথাটি সব সময়ে মনে রাখি না বলেই সমকালীন কবিদের মধ্যে সাদৃশ্য আবিষ্কারের ভ্রান্ত প্রয়াসে কবিমানসের সত্য পরিচয়টি হারাই। ইংরেজ কাব্যসমালোচক ডেভিড সেমিল এই প্রসঙ্গে সাবধানবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন :

The truth is that styles are as various as are the authors who employ them. Reviewers talk loosely of the author's duty to write in a truly "contemporary" style. The phrase betrays a confused mind. Any style is contemporary that convincingly expresses the mind and sentiment of a man alive at the present time. Such styles may be as diverse as are those of Mr. Betjeman, Mr. Empson and Dylan Thomas. On the other hand, the man, who has no live and individual vision of reality to express, produces lifeless works whether he seeks to speak with the tongue of Housman or of Mr. Eliot.

বর্তমানকালের জীবিত মানুষের ভাবনার বিশ্বস্ত রূপায়ণ এবং বাস্তব-সত্যের ব্যক্তিগত অনুভবক্ষমতা : এই দুটি শর্ত যিনি পালনে সক্ষম, তিনি সৎ বিবেকী আধুনিক কবি।

হরপ্রসাদ মিত্রের 'সাম্প্রতিক স্বনির্বাচিত কবিতা' পড়ে উপরিউক্ত চিন্তা মনে এলো এবং স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, উক্ত ভাবনার আলোকে, হরপ্রসাদ মিত্র আধুনিক কবি এবং স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে বিশিষ্ট। এই সংকলনের কবিতাগুচ্ছের রচনাকাল ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দ। আমাদের চেনা জগতের নিকটকালের নানা সমকালীন ভাবনা এই কবিতাগুচ্ছের প্রেরণাস্থল।

হরপ্রসাদ বাবুর কবিতাগুলিতে একটি আত্মস্থ কবিকণ্ঠের নম্র অথচ প্রত্যয়নিষ্ঠ স্বর শুনি। কবি যে স্বভাবনায় স্থিতি লাভ করেছেন তা প্রতি চরণেই অনুভব করি। সংশয় ও বিশ্বাসচ্যুতির মুহূর্মুহুঃ উদ্ভ্রান্তির ঘূর্ণিপাকের আবর্তে কবি ধরা দেন নি। নগরজীবনের ধূসরতা ও নাগরিক মনের নিঃসঙ্গতা তাঁকে ক্লান্ত ও প্রকৃতিবিমুখ করে নি। তাই সুস্থ জীবনচেতনার পরিচয় এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে যে মানুষ নিয়তই পীড়িত হচ্ছে, তার বেদনা কবি সহানুভূতির সঙ্গে ধরেছেন। নগরজীবনের কৃপণ মুঠি থেকে যে ভাঁরু বাসনার অঞ্জলি বারবার স্খলিত হয়, তার বেদনাকে কবি রূপ দিয়েছেন। কবির বাক্‌ভঙ্গিমা, ছন্দব্যবহার, প্রতীক ও চিত্রকল্প রচনায় যে স্বাতন্ত্র্য এই সংকলনে পরিস্ফুট, তাতেই কবির মানসিকতা ধরা পড়েছে।

বর্তমান সংকলনে যে জীবননিষ্ঠ নম্র কণ্ঠস্বর শুনি, তার পিছনে একটি অনুরাগী প্রকৃতিপ্রেমী মননশীল কবিমন ক্রিয়াশীল। দৈনন্দিন সংলাপের ঢঙ কবি সুকৌশলে ছন্দে

ব্যবহার করেছেন। অসম চরণের বন্ধুরতার মাঝে এক-একটি সুষম বর্ণনা একটি আপাত-বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছে ও নোতুনতরো স্বাদের কবিতার জন্ম দিয়েছে। যে বিরল নির্ভুল রেখায় হরপ্রসাদ বাবু জীবনের ছবিটি এঁকেছেন, তার ঋজুতা ও গভীর সারল্য আমাদের মুগ্ধ করেছে, একথা স্বীকার্য। অপরিচিত প্রসঙ্গ ও দুরূচ্চার্য শব্দের মোহ কবি বর্জন করেছেন, এজন্য কবিতাপাঠক হিসেবে আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। দৈনন্দিনের চলচ্ছবিতে কবি হরপ্রসাদ মিত্র জীবনের নিত্যরূপকে প্রত্যক্ষ করেছেন, তার সামান্য পরিচয় গ্রহণ করা যাক্।

রাত ফুরোবার আগে ভোরে দেখা ছায়াতে ছায়াতে
দেয়ালে পুরোনো ছবি;
কতো দূর নদীর বালিতে
চাকার গভীর দাগ রেখে রেখে
বনের কিনারা—
উজিয়ে গিয়েছে চলে
ভিন্‌গাঁর গোযান-যাত্রীরা!

রান্নার আস্তাণে, স্নানে, শব্দে, গানে সহস্র ঝেংকারে
জীবনের রাজহংস ডানা ঝাড়ে প্রাত্যহিক রোদে।
তারপর, বাসে ভিড়—
ঘাস-ঝরা প্রচণ্ড সকাল।
ঋতুর খেয়ালী-সংঘ গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ মিলিয়ে।
এবং প্রত্যহ ফেরা সেই মতো
ভাঁটিতে, উজানে!
সময়ে বালির রঙ,
শ্রান্তি, শান্তি
ঘরের আকাশে। ('ঘরের আকাশ')

প্রাত্যহিক জীবনের আকাশে জীবনের রাজহংসের পক্ষবিধুনন এখানে শোনা যায়। হরপ্রসাদ মিত্রের 'সাম্প্রতিক স্বনির্বাচিত কবিতা' এই পক্ষবিধুননে মুখরিত।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

কেশবচন্দ্র ॥ মণি বাগচি প্রণীত। জিজ্ঞাসা, কলিকাতা। দাম ৪.৫০ নঃ পঃ

অনেক-অনেকদিন আগের কথা। তপোবনচারী ঋষির ধ্যানলোকে পরম সত্যের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হলো। তপস্যাসন হতে ঋষি উঠে দাঁড়ালেন। বিশ্বজনকে ডেকে বললেন তিনি জীবন রহস্যের মূলতত্ত্ব জেনেছেন। তারপর কতদিন গেছে। বেড়েছে পৃথিবীর বয়স। ঊনবিংশ শতাব্দীর শিপ্রহর। তরুণ বাংলা সচকিত হয়ে শুনলো কার কথা—Young Bengal, this for you.

আপনার তপস্যালব্ধ জ্ঞান কেশবচন্দ্র রেখে গেছেন তার উত্তর পুরুষের জন্য আর—ভাষা-

কার মণি বাগচি কেশবচন্দ্রের জীবন আলেখ্য রচনা করে উৎসর্গ করেছেন— "Young Bengal, this is for you. আজকের তরুণ বাংলা উত্তরাধিকার সূত্রে তার ধন পেলো।

ঊনিশ শতক ভাঙনের যুগ। মধ্যযুগের অনাচার, কদাচার, কুসংস্কার আর অন্ধ মূঢ়তাকে ভেঙ্গে দিলেন রামমোহন, কিন্তু গড়বার সময় তিনি পেলেন না। কর্মযজ্ঞের উদ্বোধন করে যুগ-পুরুষ অন্তর্হিত হলেন। যজ্ঞাগ্নি নিভে যেতো, নেমে আসতো গাঢ় অন্ধকার যদি সেদিন অভাব ঘটতো যোগ্য ঋত্বিকের। চিন্তায় উদার, কর্মে স্পন্দিত, গতিতে চঞ্চল যে স্বাধীন ভারতের রূপ সেদিন রামমোহনের ধ্যানলোকে প্রতিভাত হয়েছিল তাকে রূপায়িত করবার ভার ছিল তাঁর উত্তরাধিকারীগণের হাতে। দেবেন্দ্রনাথ নিয়েছিলেন সেই পুতাগ্নি রক্ষার দায়িত্ব—কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথের বলিষ্ঠ দক্ষিণ হাত। দেবেন্দ্রনাথ—ধ্যান, কেশবচন্দ্র-সৃষ্টি। দেবেন্দ্রনাথ—চিন্তা, কেশবচন্দ্র —কর্ম। দেবেন্দ্রনাথ সেই মহাবাক্য যা যুগে যুগে শুদ্ধ অন্তরে প্রকাশিত হয়, কেশব-চন্দ্র সেই শ্বেতাশ্ববাহন যিনি একছত্র তলে সমগ্র বিশ্বকে একত্র করেন।

কেশবচন্দ্র ছিলেন সেদিনের বাংলার জাগ্রত যৌবন। বর্তমান সমাজ ও মানুষের মন কেশবের সময় হতে অনেক বদলে গেছে। সেদিন তরুণ বাঙ্গালীর সামনে অগ্রসর হবার প্রেরণা যুগিয়েছিলেন কেশবচন্দ্র। বলাবাহুল্য আজকের বাংলার চিন্তা ও সমাজ গড়েছেন যাঁরা তাদের অন্যতম কেশবচন্দ্র। বাংলাদেশ কিন্তু এই দেশসেবীকে তেমন করে গ্রহণ করেনি, বোঝেনি তাঁর বহুমুখী কর্মধারা। কেশব সম্বন্ধে এ নিরুৎসাহের প্রথম ও প্রধান কারণ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে মত বিরোধ। কেশব যে সমাজভুক্ত ছিলেন তার চিন্তা উদার হলেও আয়তন সীমিত। মতবিরোধে গণ্ডীর আরো সংকোচন ঘটেছিল, ফলে স্ব সমাজে কেশবের স্বীকৃতি সংকুচিত হলো। হিন্দু সমাজের বিদগ্ধগণ কেশবের সম্বন্ধে অবহিত থাকলেও জনসাধারণ তাঁকে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক বলেই জানে আর দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে মতবিরোধ ঘটিত বিচ্ছেদের খবরটাও তাদের কিছু কিছু জানা আছে। কোনো সাহিত্যিকের উৎসাহ, কোনো গবেষকের অনুসন্ধিৎসা এখন পর্যন্ত কেশব-মানসের স্বরূপ উদ্ঘাটনে অগ্রসর হয়নি।

ব্রাহ্মসমাজকে সর্বভারতীয় রূপ দিয়ে, বাংলাকে কেন্দ্র করে সমস্ত ভারতবর্ষকে কেশব-চন্দ্র এক ঐক্যবোধে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। ধর্ম আর ভক্তি যে কর্মের উৎস এ সত্য কেশবচন্দ্র নিজের জীবনে প্রমাণ করেছেন। শিক্ষায়, সাহিত্যে, সংবাদ পত্রে, মেহনতী মানুষের প্রতি দরদে যে কেশবের কর্ম রূপায়িত হয়েছিল তাঁর কথা আজ বহুবার করে বলবার ও শুনবার সময় এসেছে। লেখক কেশব, শিক্ষক কেশব, কর্মী কেশব, ঈশ্বর প্রেমিক কেশব—এক কথায় উনিশ শতকের সংস্কৃতির ধারক ও বাহক কেশবচন্দ্রের কথা মণি বাগচি বলেছেন, আর সেই সঙ্গে বলেছেন সে সময়ে নব জাগরণের ইতিহাস, সমাজের বিস্তার ও তার সর্বভারতীয় রূপ, খৃষ্টীয় ধর্ম প্রচারকদের সঙ্গে নবীন বাঙ্গার সংঘর্ষের কথা। লেখক সত্যকে উদ্ভাসিত করেছেন তার বর্ণান্তর ঘটাননি।

এতগুলি তথ্য একটি গ্রন্থে প্রকাশ করতে হলে তার আয়তন বৃদ্ধি না করে উপায় থাকে না, কিন্তু আলোকশিল্পী যেমন মূর্তির বিশেষ বিশেষ স্থানে আলোকপাত করে তার সব ব্যঞ্জনা ও গরিমা উদ্ভাসিত করে শ্রীবাগচিও কৌশলী লেখনীর কয়েকটি স্পর্শে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর যুগলক্ষণ, তার ইতিহাস আর চিন্তানায়ক, কর্মী, অধ্যাত্ম চেতনা সমৃদ্ধ কেশবচন্দ্রকে প্রকাশ করেছেন। লেখক প্রথম দৃষ্টিপাত করেছেন যুগের প্রতি, সমাজের প্রতি, মানুষের চলমান চিন্তাধারার প্রতি, তারপর নূতন ধর্মের প্রতি। কিন্তু এ দৃষ্টিপাত এমন শিল্পী জনোচিত যে কখনোই মনে হয়না ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজের প্রচ্ছদপট রচনা করে তার উপর তিনি কেশবচন্দ্রকে স্থাপন করেছেন।

একদিন ছিল যখন বাংলাদেশ ক্ষেপেছিল সাহেব বনবার জন্য। তখন য়ুরোপ শাসন করতো—দেশ শাসিত হতো। য়ুরোপ সংস্কার আনতো—দেশে সংস্কৃতি আসতো। য়ুরোপ বলতো—ভারত শুনতো। হঠাৎ বাংলা চমকে উঠলো। এবার এশিয়া শোনাবে—য়ুরোপ শুনবে। এশিয়ার বলবার কথা আছে আর সে কথার মধ্যে শুনবার মত বস্তুও আছে। এ বাণী শোনাবে বাঙ্গালী। এই বক্তা, দেশপ্রেমিক আর কর্মী কেশবের কথা বলতে গিয়েই উদ্ঘাটিত হয়েছে শতাব্দীর ঐতিহাসিক পরিস্থিতি। আলোচ্য গ্রন্থকে তাই সুধীজন ও সংস্কৃতি-সচেতন বাঙালী-মাত্রই স্বাগত জানাবেন বলে বিশ্বাস করি।

কেশব সম্পর্কিত ইতিহাসের অতিরঞ্জন অথবা বিকৃতি সম্বন্ধে আমরা কিন্তু লেখকের সঙ্গে একমত হতে পারিনি। কেশবের প্রতি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবের কারণ দেশবাসীর বিদ্বেষ ও অবহেলা নয়, এ হলো গোষ্ঠীধর্মসঞ্জাত উদাসীনতা। কেশবের চিন্তা, কাল, যুগ, সমাজ ও ভৌগলিক গণ্ডী অতিক্রম করেছিল সত্য কিন্তু মানুষ হিসাবে তিনি একটি স্বল্পায়তন গোষ্ঠী বা মণ্ডলীর নেতা ছিলেন। গোষ্ঠীপতিদের গুণ বা দোষ কখনই সমাজ-স্বরূপে প্রকাশিত হয়না। সেদিনের যুগ নায়কদের মানস-লোকের মানচিত্র প্রকাশের ভার তাই বর্তমানের ভাষ্যকারের হাতে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মণ্ডলীভুক্ত প্রায় সকল লেখকই কেশবচন্দ্রের উল্লেখ যথেষ্ট শ্রদ্ধার সঙ্গে করেছেন। তাঁদের সম্পর্কে লেখকের অনুযোগের কারণ কিছুটা কাল্পনিক বলেই মনে হয়। কেশবচন্দ্রের 'নববিধানের' সৃষ্টি না হলে রামমোহনের ব্রাহ্মধর্ম যে "ঠাকুরবাড়ীর পারিবারিক অনুষ্ঠান" হয়ে থাকতো শ্রীবাগচির এ সিদ্ধান্তেও সন্দেহের অবকাশ আছে।

লেখক কেশবচন্দ্রের যে পরিচয় আমাদের দিয়েছেন তাতে তিনি হিন্দু বা ব্রাহ্ম, ভারতীয় অথবা বাঙ্গালী এ প্রশ্ন অনুচ্চারিত থেকে যায়। মন ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে—এত যিনি দিয়েছেন তাঁকে হয়তো যোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয়নি।

শ্রীবাগচির ভাষা স্বতঃস্ফূর্ত ও মধুর। সোজা মর্মমূলে পৌঁছায়; আবার দুরূহ বিষয় নিয়ে আলোচনা-যোগ্য বলিষ্ঠতাও তাঁর ভাষায় আছে। আলোচ্য গ্রন্থখানি যেন ঋজু বাতায়ন। ওধারে দৃষ্টি ফেললেই দেখা দেবে গতযুগের বিস্তৃত ইতিহাস আর নক্ষত্রউজ্জ্বল ছায়াপথ।

নমিতা চক্রবর্তী